রক্তাক্ত ৭১-
ঘাতক কে?

আলীমুল আল হোসেন মিতুল

রক্তাক্ত '৭১—
ঘাতক কে?

আলীমুল আল হোসেন মিতুল

www.pathagar.com

রক্তাক্ত '৭১ ঘাতক কে?

এ, এ, হোসেন মিতুল

প্রকাশক ঃ এস, এ, এ, হোসেন সুমন

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই আগষ্ট '৯২

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাপ্তি স্থান ঃ

১। প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট,
ঢাকা-১২১৭

২। আশা বুক কর্ণার
৪৩৫, এলিফেন্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

৩। প্রীতি প্রকাশন
১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

৪। মিশন বুক কর্ণার
কেন্দ্রীয় মসজিদ কাঁটাবন,
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

৫। ইসলাম প্রচার সমিতি
কেন্দ্রীয় মসজিদ কাটাবন
এলিফেন্ট রোড, ঢাকা

বিনিময় ঃ ত্রিশ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সেই সমস্ত নরশার্দুল মর্দে মুজাহিদদের হাতে, যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত তথা মানুষের মনগড়া মতবাদ মতাদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষ–ধর্মহীনদের সাথে আমরণ সংগ্রামমুখর জীবন যাপন করছে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দানে প্রস্তুত।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণকর্মী তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব এ, এ, হোসেন মিতুল কর্তৃক লিখিত "রক্তাক্ত '৭১– ঘাতক কে?" বইটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। কারণ আমার মত যারা ১৯৭১ সনের পরে পৃথিবীতে এসেছে এবং '৭১ সনে যারা শিশুকিশোর ছিল তারা আজ ইসলামের শত্রু গণআদালতীদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় ইসলামপন্থীদেরকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দুশমন ও ঘাতক বলে মনে করে, তাদের কাছে আমার আবেদন আপনারা আবেগমুক্ত মন মানষিকতা নিয়ে বইটি অধ্যয়ন করুন তাহলে বুঝতে পারবেন কারা দেশের শত্রু এবং কারা দেশপ্রেমিক। লেখক ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়ীক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদীদের কূটকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইতিহাস দিয়ে প্রমাণ করেছেন, খোদ আওয়ামী–বাকশালীরাই স্বাধীনতার আলখেল্লা পরে দেশের স্বাধীনতা ভারতের কাছে বিকিয়ে দেবার হীন চক্রান্তে ব্যস্ত।

ইতিহাস দিয়ে লেখক এ কথাও প্রমাণ করেছেন '৭১–এর ঘাতক ও স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামী নয়– খোদ আওয়ামী লীগ। বইটি পড়ে যদি কারো মন–মানষিকতা থেকে ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর হয় তাহলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে ইনশাল্লাহ।

প্রকাশক

এস, এ, এ, হোসেন সুমন

www.pathagar.com

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামপন্থীদের উৎখাত করার জন্যে ইসলামের শত্রুরা ইসলামের সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে কল্পিত অপরাধের অভিযোগ তুলেছে। ১৯৭১ এর পরে গতানুগতিকভাবে বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন জামায়াতে ইসলামী এবং তার আমীর বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন ধরনের কল্পিত অভিযোগের ধূয়া তুলে এদেশে ইসলামের গতিপথে বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। '৭১ সনের প্রকৃত ইতিহাস গোপন করে সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় দালালেরা জাতির নতুন প্রজন্মদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলার ঘৃণ্য চেষ্টা চালাচ্ছে। '৭১ সনের বস্তাপচা আলবদর রেজাকার নামক ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যুব শক্তির ব্রেন অপারেশন করে মুসলিম যুবকদের বাংগালী জাতি বানানোর ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

উদোরপিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা ধোয়া তুলসীর পাতা সেজে ইসলামপন্থীদের স্বাধীনতা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক শক্তি '৭১ এর ঘাতক ইত্যাদি নামে জাতির কাছে পরিচিত করার ষড়যন্ত্র করে '৭১ এর দায়-দায়িত্ব ইসলামপন্থীদের কাঁধে চাপিয়ে ভারতীয় দালালেরা দেশপ্রেমিক সাঁজার অপচেষ্টা করছে।

এই দালাল গোষ্ঠী ধর্মের নাম ভাংগিয়ে জনগণকে ধোকা দিয়ে ভোট নিয়ে ইসলামপন্থীদের সহায়তায় ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বাংলার মাটি থেকে। ক্ষমতাসীন বি, এন, পি সরকারের সহযোগীতায় তথাকথিত গণ-আদালতীরা ইসলামপন্থীদের উৎখাত করার জন্যে নির্মূল কমিটি গঠন করে দেশের বুকে ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। যে গণ-আদালতীদের উসকানিতে বহু মূল্যবান প্রাণ ঝরে গেল, শত শত মানুষ আহত হলো, দেশের সম্পদ নষ্ট হলো, সি, এম, এম, কোর্টে হামলা চালানো হলো, তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যহার করার ঘোষণা দিয়ে বি, এন, পি, সরকার নিজেদেরকে আওয়ামী-বাকশালীদের ন্যায় ভারতের দালাল বলে জাতির কাছে প্রমাণ করেছে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জাতির নতুন প্রজন্মদেরকে জামায়াতে ইসলামী ও তার নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে রাখার অপচেষ্টা চালানো

www.pathagar.com

হচ্ছে। এই ঘৃণ্য বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যেই স্বল্প সময়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এই বইটি লিখা। বইটি লিখতে গিয়ে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। আমি এ সমস্ত দ্বীনের খাদেমদের জন্যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে আবেদন করি, আল্লাহ তাদেরকে ও আমাকে আমৃত্যু পর্যন্ত তার দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক এনায়েত করুন। আর যাদের উদ্দেশ্যে এই বইটি লিখা সেই নতুন প্রজন্মগণ বইটি পড়ে তাদের একজনও যদি বিভ্রান্তিমুক্ত হয়ে খালেছ নিয়তে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মাল ও জান কোরবানী দিয়ে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক হযেছে বলে মনে করবো।

নিবেদক,

(খাকছার)

আলীমুল আল হোসেন মিতুল

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। ঘাতকের পরিচয়, ২। ঘাতকের চরিত্র ও জামায়াতের চরিত্র, ৩। জামায়াতের আন্দোলন, ৪। জামায়াত কি চায়? ৫। কেন চায়? ৬। কি ভাবে চায়? ৭। জামায়াতের চাওয়া কি নতুন কিছু? ৮। জামায়াত বিরোধিতার পটভূমি ৯। ১৯৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ১০। বাংলাদেশে জামায়াত শিবিরের ভূমিকা ১১। স্বাধীনতা বিরোধী কারা? ১২। জনগণের রায়ের প্রতি আওয়ামী লীগের বিশ্বাসঘাতকতা। ১৩। স্ব-বিরোধী চার মূল নীতি। ১৪। আওয়ামী লীগের শাসন-দুঃস্বপ্নের কালো ইতিহাস। ১৫। আসসামস, আল বদর ও রেজাকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা ১৬। মুক্তিযোদ্ধারা জামায়াতে কেন? ১৭। জামায়াত শিবিরের বিরোধীতা কেন? ১৮। কারা জামায়াত শিবির বিরোধী? ১৯। স্বাধীন মানুষ কারা? ২০। গোলাম আযম ভীতি কেন? ২১। প্রচার মাধ্যম বিভ্রান্তির কেন্দ্রবিন্দু। ২২। শিরকের শ্লোগান ২৩। ইতিহাসের আলোকে এদেশবাসীর কর্তব্য। ২৪। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বন্দ্ব ২৫। ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ ২৬। ধর্মনিরপেক্ষতার গোড়ার কথা ২৭। বিজ্ঞানী ও পাদ্রীদের সংঘাত ২৮। গীর্জা বনাম রাষ্ট্র ২৯। লুথারের আপোষ প্রস্তাব ৩০। ভাবনার বিষয়বস্তু ৩১। মুসলমান এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ৩২। যুক্তির কষ্টিপাথরে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ৩৩। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অভিশাপ ৩৪। উদ্দেশ্যহীনতা ৩৫। নৈতিকতার অবক্ষয় ৩৬। ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের অবস্থা ৩৭। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ৩৮। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ৩৯। ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান ৪০। প্রকৃতিগত মুসলমান ৪১। আদর্শগত মুসলমান ৪২। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের শ্রেণীভেদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঘাতকের পরিচয়

ঘাতক বলতে আমরা এমন কোন প্রাণী জন্তুজানোয়ার যন্ত্র বা মানুষকে বুঝি, যে মানুষ, জন্তুজানোয়ার, প্রাণী বা যন্ত্র, যা অন্য কোন প্রাণী বা মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, কোন নর খাদক প্রাণীর দ্বারা কোন মানুষ নিহত হলে আমরা সেই হিংস্র প্রাণীকে ঘাতক প্রাণী বলে আখ্যায়িত করি, কোন যন্ত্র দ্বারা কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমরা সেই যন্ত্রকে ঘাতক নাম দেই, আজকাল যন্ত্রদানব ট্রাকের নীচে পিষ্ট হয়ে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী নিহত হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ ট্রাককে আমরা ঘাতক ট্রাক হিসাবেই চিহ্নিত করি।

এখন একজন সুস্থ সবল শিক্ষিত মানুষকে কেন এবং কখন ঘাতক বলা যাবে, আমরা মুসলমান হিসাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো কোরান এবং হাদিস তথা ইসলামের কাছ থেকে। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষ যদি ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সত্যমিথ্যাসহ সব কিছু সঠিকভাবে অনুধাবন করার পরও ব্যক্তি স্বার্থে, দলীয় স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ইসলামের দেওয়া সীমা লংঘন করে কোন আদম সন্তানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তি ইসলামের কাছে অন্যায়কারী ঘাতক নামে চিহ্নিত হয়ে ইসলামী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ঐ অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ব্যক্তি বা দলকে ইসলাম ঘাতক বলে ঘোষণা দেয়।

আর কোন ব্যক্তি বা দল যদি ইসলামের আদেশানুযায়ী নিজকে রক্ষা, দলকে রক্ষা, জাতিকে রক্ষা, দেশকে রক্ষা সর্বপরি ইসলামী আদর্শকে রক্ষা করতে গিয়ে হত্যা বা রক্তপাতের সাম্ভাব্য সকল পথ ও কৌশল পরিহার করার পরেও যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসে তখন ইসলামের শত্রুদেরকে ইসলাম হত্যা করার অনুমতি দেয় ধৈর্য্যের একান্ত শেষ পর্যায়ে গিয়ে।

কোন ব্যক্তির প্রতি আমরা ঘাতক শব্দটি ব্যবহার করি সাধারণতঃ ঘৃণা বা ক্ষোভের সাথে। কারণ সে অন্যায়ভাবে কাউকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। ইসলামী আদালত ছাড়াও মানুষের তৈরী করা আইন বিধান দ্বারা পরিচালিত কোন আদালত যদি চরম অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড দেয় তাহলে আমরা ঐ আদালতকে ঘাতক আদালত বলি না এই কারণে যে, অপরাধী ব্যক্তি তার ন্যায্য শাস্তিই পেয়েছে।

জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ময়দানে চতুর্দিক থেকে যত অপবাদ জামায়াতের দিকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে বিভিন্ন গোষ্ঠি বা দলের পক্ষ থেকে, সে অপবাদগুলি জামায়াতের প্রাপ্য কি–না, সেগুলি এখন আমরা আলোচনা করবো ইসলামী দৃষ্টিভংগী সামনে রেখে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি ইসলাম ঘাতক নামে কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। সুতরাং ইসলামে ঘাতকের সংজ্ঞা হলো, ইসলামের আদেশ ব্যতিত কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন আদম সন্তানকে স্বজ্ঞানে সুস্থ মস্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তিই ঘাতক নামে পরিচিতি লাভ করে। আর এটাই হলো ইসলামে ঘাতকের সংজ্ঞা।

ঘাতকের চরিত্র ও জামায়াতের চরিত্র

একজন বা একদল ঘাতক তারা ন্যায়–অন্যায়, ভালো–মন্দ সুন্দর–কুৎসিত, সত্য–মিথ্যা আইন আদালত কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না। তার বা তাদের কাছে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। নিজ স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে এই ঘাতকগোষ্ঠি দেশব্যাপী রক্তের বন্যা বইয়ে অগণিত আদম সন্তানের রক্তে স্নান করতে দ্বিধাবোধ করেনা। এরা নিজেদের রক্ত পিপাসা মিটাবার জন্য তুচ্ছ কারণে রক্তপাত ঘটাতে পারে। মানুষের তৈরী করা আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে এদের জীবন গড়ে উঠে ভোগবাদের উপর, ফলে আকর্ষণীয় সুন্দর সৎ চরিত্র গড়তে এরা ব্যর্থ হয়। চরিত্র গড়তে ব্যর্থ এই চরিত্রহীন ব্যক্তিরা কিন্তু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়। এরা এই সমাজেরই অধিবাসী। এই সমাজের কিছু মানুষ যখন আল্লাহর দেওয়া আদর্শ ইসলাম অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র গঠন করে এই গোটা মানব সমাজটাকেই তারা ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে, তখন ঐ সমস্ত ভোগবাদে বিশ্বাসী চরিত্রহীন ব্যক্তিরা নিজেদের নিশ্চিত তরাডুবি দেখে ব্যক্তিগতভাবে বা দলীয়ভাবে এরা প্রতিপক্ষ সৎ চরিত্রবান লোকগুলিকে কোন বৈধ কারণ ছাড়াই হত্যা করে।

www.pathagar.com

সংগত কারণেই মানুষের তৈরী করা কোন মতাদর্শ মানুষের মনের মধ্যে পরকাল ভীতি, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়, ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ অত্যন্ত নীচু স্তরে নেমে যায়। আর এই ধরনের মানুষগুলির কাছে থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ ভালো কিছু আশা করতে পারে না। নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে যেকোন ঘৃণ্যপথ এরা অবলম্বন করতে পারে। ব্যক্তি বা দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে মিথ্যা সংবাদ নিজেদের সংবাদ মাধ্যমগুলির দ্বারা এরা নির্লজ্জভাবে প্রচার করে মানুষকে গোলক ধাঁ–ধাঁয় ফেলে। দেশব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে নিজেরাই গোলাগুলি বোমাবাজী করে, লাশ নিয়ে মিছিল করে রাস্তায় নামে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য এরা দেশের প্রখ্যাত সন্ত্রাসীদেরকে দলে আশ্রয় দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে। মুখে সহনশীলতা, ধৈর্য্য, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের শ্লোগান দিলেও দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা থাকে অনুপস্থিত, চরিত্রে সহনশীলতার অভাবে এরা হয় অসহিষ্ণু, ফলে দলকে এরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলে। যাতে ভয়ে দলের কোন নেতা কর্মী যেন দলীয় প্রধান নেতা–নেত্রীর সমালোচনা না করে। দলীয় প্রধানের আদেশ নিষেধকেই দলের অনুসারীরা প্রশ্নাতীতভাবে যাতে মানতে বাধ্য হয় তার জন্য ঘাতক প্রধানরা দলের অভ্যন্তরে তার অনুকূলে পরিবেশ তৈরী করে। আদর্শিক দেউলিয়াপনার কারণে এরা প্রতিপক্ষকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। প্রতিপক্ষের অফিস ভাংচুর, দেওয়াল লিখন মুছে ফেলা, পোষ্টার ছিড়া, মিছিলে হামলা ইত্যাদি ন্যক্কারজনক কাজ এদের স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায়। নিজ এবং দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ঘাতকরা জাতিকে চরিত্রহননের পথে পরিচালিত করে গোটা জাতিকে নিজেদের ন্যায় চরিত্রহীন করার অপচেষ্টা করে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য এরা জাতি ও দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামে পরিণত করে। প্রতিপক্ষের সমালোচনা করতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ তো করেই এমনকি অত্যন্ত গর্হিত ও আপত্তিকর ভাষা এরা ব্যবহার করে। নিজেদের ঘাতক চরিত্র সাধারণ জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যে এরা নিজেদের কর্মকান্ডকে "মানব সেরা" নাম দেয়। দেশকে স্থিতিশীল হতে না দেওয়ার জন্য এরা নানা ধরণের গণ–বিরোধী কর্মসূচি দিয়ে তাদের উচ্ছৃংখল কর্মীদেরকে সক্রীয় রাখার জন্যে ময়দানে নামায়। কর্মীরা ময়দানে নেমে নিজেদের সক্রীয়তা জাহির করার

www.pathagar.com

জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে গাড়ী ভাংচুর, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদির মাধ্যমে "মানব সেবার" উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

উপরে সংক্ষেপে ঘাতক চরিত্র আলোচনা করা হলো। এখন আমরা আলোচনা করবো জামায়াতে ইসলামীর চরিত্র।

ইসলামী জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে গোটা বিশ্ব আলোকিত করা মুসলমানদেরই দায়িত্ব। মুসলমানরা যখন এই দায়িত্ব ভুলে গিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ভোগ-বিলাস ও অলসতার সর্বগ্রাসী স্রোতে দেহ-মন এলিয়ে দিল আর সেই সুযোগে ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামকে ভিত্তিহীন যুক্তি দিয়ে কোনঠাসা করা আরম্ভ করলো। ইসলাম বিরোধী কুচক্রীমহল অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় তাদের প্রচারিত ও প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায়, সাহিত্যে ইসলামের বিধি-বিধানগুলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা শুরু করলো। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত মুসলমানদের অবস্থা তখন অত্যন্ত নাজুক। এমনি এক মুহূর্তে যুগ স্রষ্টা ক্ষণজন্মা পুরুষ আল্লামা মওদুদী (রহঃ) তার ক্ষুরধার লেখনী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় ইসলাম বিরোধী শক্তির বিশদাঁত ভাংগা শুরু করলেন। দীর্ঘদিন বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে সংগ্রাম চালিয়ে গুটি কয়েক ইমানদার মুসলমানদের নিয়ে গঠন করলেন জামাতে ইসলামী। কোরআন হাদিস তথা নবী (দঃ) এর আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে যাদের কিছুটা হলেও পরিচয় আছে, তারা এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ইমাম মওদুদী (রহঃ) এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইমাম হাছানুল বান্না (রহঃ) আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ইসলামকে সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য রছুল (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সংগঠন পদ্ধতি তথা ইসলামের অনুমোদন ব্যতিত ঐ দুই মহান সৈনিক স্বজ্ঞানে সামান্যতম বাতিল পদ্ধতিরও প্রশ্রয় দেননি সংগঠনে। নবী (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করে জামাতে ইসলামী দ্বীনি দায়িত্ব পালন শুরু করলো। আজ আল্লাহর রহমতে জামায়াতে ইসলামী নামটা খোদাহীন শক্তির জন্যে আতংকজনক।

জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মওদুদী (রহঃ)। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত কোন দল, সরকার বা সমাজের সাধারণ একজন মানুষও কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে, জামায়াতে ইসলামী- ইসলাম বিরোধী কোন

www.pathagar.com

কাজ করেছে বা সমর্থন যুগিয়েছে? হ্যাঁ, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা ইসলাম বিরোধী মহল বলবেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে জামায়াতের ভূমিকা ও ১৯৭১–এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা কোরআন হাদিসের মানদন্ডে কতটুকু বৈধ? অথবা ইমাম মওদুী (রহঃ) এর বিভিন্ন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক মাওলানা সাহেবেরা কোরআন হাদিস দিয়ে মওদুদী (রহঃ) এর মন্তব্য ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রমাণ করেছেন এবং বইও লিখেছেন। এ সমস্ত প্রশ্ন যারা করবেন, তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো, আপনারা বুঝবার ও গবেষণার মন মানসিকতা নিয়ে কোরআন হাদিস অধ্যয়ন করুন, জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশিত সাহিত্য ও পত্র–পত্রিকা মনযোগ দিয়ে পড়ুন, তা হলে আপনাদের মনের সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান আন্দালনে কি ভূমিকা নিয়েছিল এবং বাংলাদেশে ১৯৭১–এ কি ভূমিকা নিয়েছিল, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর চরিত্র আলোচনা করা যাক।

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ জন্ম লাভ করার পর থেকে এ দেশে যতবার সামরিক জান্তারা ক্ষমতা দখল করে জনগণের অর্থ তছরূপ করে সামরিক জান্তারা যখন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন, তখন হালুয়া–রুটির লোভে সবদলেরই নেতা–কর্মী পংগপালের মত সামরিক জান্তার দলে ভিড়েছে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কোন নেতা তো দূরে থাক একজন নগন্য কর্মীও বৈষয়িক স্বার্থে দল বদল করেনি। জামায়াত টাকায় বিক্রি হয় না। জামায়াতের কোন নেতাকে কঠিনতম নির্যাতন করেও আদর্শচ্যুত করা গেছে কি? জামায়াতের কোন নেতা পত্র পত্রিকায় মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে কি? কোন ধরনের অবৈধ ব্যবসায় জামায়াতের কোন রোকন জড়িত আছে কি? (যদি থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় জামায়াতকে অবগত করুন, কেন্দ্রীয় জামায়াত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে) এ দেশের তৌহিদী জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর মজলুম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসায় ইসলামের দুশমনরা যখন বোমা হামলা চালালো তখন ইসলাম প্রিয় জনগণ বিশাল মিছিল নিয়ে রাজধানীসহ সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল, ঐ সমস্ত মিছিল থেকে কারো প্রতি একটি ঢিল ছোড়া হয়েছে কি? প্রতিবাদকারীরা জ্বালাও পোড়াও ভাংচুর করেছে কি? ঢাকা

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটিতে জামায়াত নেতা নিজামীকে হত্যা করার বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে জামায়াত শিবির আক্রমণকারী দলের নেতা কর্মীদের আক্রমণ করেছিল কি? জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের যখন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তার প্রতিবাদে জামায়াত শিবির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করে- না অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করে? অন্য কোন নেতা কর্মীরা তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে পিটাপিটি করে মরলেও তারা রাস্তায় নেমে জনগণের গাড়ী ভাংচুর করে, জামায়াতের এমন কোন ইতিহাস আছে কি? হ্যাঁ, জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে অনেক পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ লিখা হয় বটে, কিন্তু তথাকথিত ঐ সাংবাদিকরা তাদের লিখার স্বপক্ষে কোন প্রমান পেশ করতে পারবে কি? (আর পত্রিকাগুলি কাদের তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে) স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অনেক দলের ভূমিকাই ছিল, "দিনে রাজপথে রাত্রে স্বৈরাচারের বাসভবন," জামায়াত স্বৈরাচারের বিন্দু পরিমাণ সহযোগী ছিল, একথা কেউ প্রমাণ করতে পারবেন কি? কেয়ার টেকার সরকারের ধারণা তো কোন দল দিতে পারেনি প্রথমে, জামায়াতই সর্বপ্রথম এই ধারণা জাতির সামনে পেশ করে এবং জামায়াতের দেওয়া ফরমূলা অনুযায়ী এরশাদ সাহেব ক্ষমতা ছাড়েন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাসুরের নাম মুখে আনতে লজ্জা করে, তাই জামায়াতের কল্যাণমুখী চরিত্রের কথা জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা হয়। বি,এন,পি'র সরকার গঠনের সময় জাতির মহা সংকটকালে জামায়াতই জাতিকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে উদ্ধার করতে নিঃশর্তভাবে এগিয়ে আসে। এক নায়কতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে জামায়াতের ভূমিকাই ছিল মূখ্য।

যে সব এলাকায় জামায়াত প্রার্থীরা নির্বাচনে বিজয় লাভ করতে পারেননি, সে সব এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে জামায়াত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেছে কি? সারা দেশে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবা করে যাচ্ছে জামায়াত। মশক নিধন কর্মসূচী, সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচী, রাস্তাঘাট মেরামত সহ অসংখ্য জনহিতকর কর্মসূচী জামায়াত গ্রহণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জামায়াত শিবিরের নেতা কর্মীরা ঝাড়ু হাতে নিয়ে যেভাবে রাস্তা-ঘাট নালা পরিস্কার করে, অন্য কোন দল এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন কি?

www.pathagar.com

অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষিত করা, সাধ্যানুযায়ী বেকারদের কর্ম সংস্থান করে দেওয়া, গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া, গভীর নলকূপ বসিয়ে জনগণের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া, মানুষের মধ্যে পরকালের ভীতি সৃষ্টি করে সমাজকে অনাচার মুক্ত করা সহ ইত্যাদি কাজ জামায়াত ঈমানের সাথে করে যাচ্ছে।

ইসলাম বিরোধী সামান্যতম কাজে জামায়াতের কোন কর্মী যুক্ত থাকলে তাকে রুকন (সদস্য) করা হয়না, সুদভিত্তিক ব্যাংকে বা সহশিক্ষায় জড়িত এমন কোন মহিলা-পুরুষকে জামায়াত রুকন (সদস্য) করেন না। শিবিরের কোন কর্মী পরীক্ষায় অসুদুপায় অবলম্বন করলে তাকে সদস্য করা দুরে থাক সাথীও করে না।

আল্লাহর ভীতির কারণে জামায়াতের কোন ব্যক্তি নেতা হবার ইচ্ছা পোষণ করে না, সগঠনের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়। এই সংগঠনে গ্রুপিং লবিং নেই। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মিছিল পান্টা মিছিল এই সংগঠনে নেই। সংগঠনের পক্ষ থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে বাধ্য হন। নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীর ছবি ছাপানোর সুযোগ নেই বা "আমাকে ভোট দিয়েন" একথা বলার অধিকার নেই। প্রার্থী দলের পক্ষে শুধু ভোট চাইতে পারবেন।

কোন নেতা কর্মীর এক ওয়াক্ত নামাজ বা একটি রোজা বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই জামায়াতে। নেতারা তাদের সকল কাজের হিসাব দিতে কর্মীদের কাছে বাধ্য। কোন সন্ত্রাসীর স্থান জামায়াত শিবিরে নেই। জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা এবং বর্তমানে সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংসদে দাঁড়িয়ে অন্যান্য সব দলের নেতা-নেত্রীদের সামনে রেখে চ্যালেঞ্জ করেছেন, "জামায়াত শিবির সন্ত্রাস করে না, কোন কর্মীকে অস্ত্রসহ ধরতে পারলে পুলিশ ধরুক, আমি ছাড়ানোর জন্যে তদবীর করবো না"। পক্ষান্তরে দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, অন্য কোন দলের নেতা-নেত্রীরা এমন চ্যালেঞ্জ দিতে পারেনি, পারলে শিক্ষাঙ্গন সহ দেশের সব জায়গা সন্ত্রাস মুক্ত হতো।

স্বৈরাচারী এরশাদের পাতানো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গীয় জামায়াত ও শিবিরের কর্মীরা নিজের জান-মাল কোরবানী দিয়ে হলেও অমুসলিম ভাইদের জান-মাল

www.pathagar.com

ইজ্জত রক্ষা করেছে। এ কথার প্রমাণ অমুসলিমরাই দিবে ইনশাল্লাহ। সুতরাং জামায়াতের চরিত্র সম্পর্কে বিশদভাবে লিখতে গেলে আলাদা একটি গ্রন্থই রচনা করা যায়। অতএব, শিক্ষিত সচেতন জনগণই বিচার করবেন জামায়াত শিবিরের চরিত্র।

জামায়াতের আন্দোলন

পৃথিবীতে মানুষেরা যখন নিজেদের তৈরী আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে জাতি ও দেশকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এনে দাঁড় করেছে ঠিক তখনই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী বা রছুল পাঠিয়ে মানব মন্ডলীকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেছেন। নবীগণ যে দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, ঐ দায়িত্ব পালনের পর আল্লাহর অমোঘ নির্দেশে দুনিয়া ছেড়ে তারা চলে গিয়েছেন, তখন সংশ্লিষ্ট নবীর অনুসারীদের উপরে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নবী কর্তৃক আনীত আদর্শকে পৃথিবীতে সমুন্নত রাখা। শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির দিশারী নবী সম্রাট মোহাম্মদ (দঃ) এই নশ্বর পৃথিবী চেড়ে যাবার পূর্বে মুসলমানদের উপরে যে গুরু দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন ঐ দায়িত্ব পালন করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য করণীয়।

অন্যান্য নবীর বিদায়ের পর তার অনুসারীরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে তারা ইতিহাসের অতলান্তে হারিয়ে গেছে এবং কয়েকজন নবীর অনুসারীরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বিকৃত আদর্শ নিয়ে বর্তমানে খাবি খাচ্ছে। পক্ষান্তরে চির অবিকৃত সার্বজনীন আদর্শ ইসলামকে নিজেদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত বাস্তবায়িত করে গোটা বিশ্বাবাসীকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার যে মহান দায়িত্ব নবী (দঃ) মুসলমানদের প্রতি অর্পণ করে গিয়েছেন, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও ঐ দায়িত্ব পালন করার জন্য জান-মাল দিয়ে চেষ্টা করছে।

নবী মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ (দঃ) যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, কোরআন ও সুন্নাহর আদেশানুযায়ী জামায়াত শিবির ঐ মিশনই জারী রেখেছে। প্রচলিত অর্থে জামায়াত শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় মিশন নয়, দলমত-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে যাবতীয় অনাচারের কবল থেকে

www.pathagar.com

উদ্ধার করে মানুষের মধ্যে পুত–পবিত্র গুণাবলী সৃষ্টি করে আল্লাহর সাথে গভীর সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দেওয়াই জামায়াত শিবিরের আন্দোলন।

জামায়াত কি চায়?

মানুষসহ পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুকেই আল্লাহ মানুষের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন। সৃষ্টি জগতের বিন্দু পরিমাণ স্থান ও নেই যেখানে আল্লাহর আইন চলছে না। মানুষ যখন আত্মার জগতে ছিল, সেখানেও আল্লাহর আইন চলেছে, চলছে অনাগত ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। পৃথিবীতে অনেক ক্ষমতাশীল মানুষেরই সন্তান হয় না। আবার কারো শুধু পুত্র সন্তান অথবা কন্যা সন্তানই জন্ম নিচ্ছে, ক্ষমতাধর মানুষ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আত্মার জগত থেকে তার নিঃসন্তান স্ত্রীরগর্ভে একটি আত্মা বা নিজ ইচ্ছায় পুত্র অথবা কন্যা সন্তান আনতে পারবে না। কারণ ঐ আত্মার জগতেও আইন চলছে আল্লাহর। মাতৃগর্ভের জগতেও মানুষ নিজ শক্তি প্রয়োগ করে গর্ভের সন্তানকে ভালো স্বাস্থ্যবান মেধাবী তৈরী করার জন্য গর্ভস্থিত সন্তানের মুখ দিয়ে কিছু খাওয়াতে পারবে না। কারণ আল্লাহ ব্যবস্থা করেছেন নাভীর সাথে নাড়ীর সংযোগ ঘটিয়ে। ঐ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করতে গেলে গর্ভের সন্তান আর পৃথিবীর মুখ দেখবে না। মাতৃগর্ভের জগতেও আইন চলছে আল্লাহর। পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি সমূহ আল্লাহর আইন মেনে চলছে। বাতাস আগুনের কাজ করে না, পানি বাতাসের কাজ করে না, সূর্য্য চন্দ্রের কাজ করে না, আল্লাহ এদেরকে যেভাবে চলতে বলেছেন তারা সে ভাবেই চলছে। এই গোটা মানব দেহটাও আল্লাহর সৃষ্টি নিয়মের অধীন।

মৃত্যুর পরের জগতেও আল্লার আইনই চলবে। পৃথিবীতে অপরাধ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ধরা পড়লে নেতা–নেত্রী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের টেলিফোনের জোরে শাস্তি থেকে বে–কসুর খালাশ পায়। কিন্তু মৃত্যুর পরের জগতে অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি পাওয়া থেকে রক্ষা করার মত শক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নেই। ঐ জগতেও আল্লাহর আইন চলবে। কেয়ামতের মাঠেও শুধু মাত্র আল্লাহর আইন চলবে। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিত কেউ কোন কথাও সেখানে বলতে পারবে না।

সুতরাং সৃষ্টিকুলের সব জায়গায় যখন আল্লাহর আইন চলছে এবং আল্লাহর

www.pathagar.com

আইন চলার ফলে কোথাও কোন বিশৃংখলা নেই, তাহলে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত ও আল্লাহর আইন চলা উচিত। আর নবীগণ এসেছেনও এই জন্যই যে, মানুষ সার্বিকভাবে আল্লাহর আইন মেনে চলুক। মানুষ যখন নিজেদের মনগড়া আদর্শ অনুসরণ করেছে এবং মানুষের উপরে মানুষের প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঠিক তখনই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অশান্তির দাবানল আলোর গতিতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

জামায়াত শিবির মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের জিঞ্জির ছিন্ন করে মানুষকে তার প্রভু আল্লাহর অনুগত বান্দা বানাতে চায়। পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান ইসলামকে সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যাবতীয় জুলুম অনাচারের মুলৎপাটন করতে চায়। জামায়াত গোটা দুনিয়াটাকে কোরআনের রঙে রঙিন করতে চায়।

কেন চায়?

সমাজ বা রাষ্ট্রে যখনই খোদাভীতিহীন লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে চরম অরাজকতা। মানুষের জানমাল ইজ্জতের কোন মূল্য থাকে না। দুস্থ মানবতার আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস বেদনা বিধুর হয়ে উঠে। আর এ সব কিছুই ঘটে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ না করার ফলে।

আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত না করার কারণে ধ্বংসের সর্বগ্রাসী প্লাবন মানব জাতিকে অনিশ্চয়তার মুখে নিক্ষেপ করে। জামায়াত-শিবির এ জন্যেই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন চায়, যাতে করে মানুষ একমাত্র আলাহর দাস হয়ে পৃথিবীতে শোষণহীন নিরাপত্তাপূর্ণ ভীতিহীন সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপন করতে পারে এবং পরকালের জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে জান্নাত পেতে পারে। জামায়াত কোরআন সুন্নাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।

কিভাবে চায়?

পৃথিবীতে নবীগণ এসে যে পদ্ধতিতে আন্দোলন করেছেন, শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব যে ভাবে দিয়েছেন, যে পদ্ধতিতে

www.pathagar.com

সংগঠন তৈরী করেছেন যে পদ্ধতি অবলম্বন করে মানব জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহ ভীরু মোত্তাকী লোক তৈরী করেছেন, সে সমস্ত ইতিহাস কেয়ামত পর্যন্ত কোরআন হাদিসে অবিকৃত থাকবে। জামায়াত ও শিবির রছুল (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পদ্ধতিতেই লোক তৈরী করছে। ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন মানুষ তৈরী না করে বন্দুকের জোরে ক্ষমতা গ্রহণ করে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় না। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাথে আমাদের মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ইমাম খোমেনী (রহঃ) দীর্ঘ দিন যাবৎ ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন লোক তৈরী করে তারপর সে দেশে ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে গণতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জামায়াত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন দল নয়। এ সংগঠন কোন নেতার উপর নির্ভরশীল নয়। এরা নেতার লাশ নিয়ে রাজনীতির ময়দানে এগিয়ে যাচ্ছে না। বাপের ও স্বামীর পরিচয়ের পুঁজি সম্বল করে যারা রাজনীতি করে জামায়াত তাদের মত মওদুদী (রহঃ) এর পরিচিতিকে সামনে রেখে ময়দানে নামেনি। জামায়াত কোরআন হাদিসের উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করে। ইসলাম রাজনীতির যতটুকু ক্ষেত্র দখল করে রাজনীতি করার অনুমতি দেয়, জামায়াত শিবির ততটুকু রাজনীতিই করে।

নারীকে প্রদর্শনীর বস্তু বানিয়ে লোক জড় করে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে গলা ফাটিয়ে প্রলাপ বকার মত কীর্তি জামায়াত করে না। কিছু সংখ্যক পুরুষ রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক চোহারা এতই কলুষিত যে, নিজেদের চেহারা সরাসরি জনগণের সামনে দেখাবার সাহস এদের নেই– তাই তারা নারীর আঁচলের আড়াল থেকে রাজনীতি করে।

জামায়াত শিবির নেতৃবৃন্দের চেহারায় কোন কালির ছাপ নেই, রিলীফ চুরি বা কম্বল চুরি, কারো সম্পত্তি জবর দখল ও ব্যাংক ডাকাতির কলংকের দাগ জামায়াত শিবিরের চেহারায় নেই, তাই এরা নিজেরাই ইসলামী আদর্শ নিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার দুয়ারে যায়।

সুতরাং শক্তি প্রদর্শন করে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে, চরদখলের কায়দায়, ভোট ডাকাতি বা মিডিয়া ক্যু করে ইসলামের বাস্তবায়ন চায় না।

www.pathagar.com

জনগণের রায় নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাতে চায় জামায়াতে ইসলামী।

জামায়াতের চাওয়া কি নতুন কিছু?

জামায়াতে ইসলামী প্রথমে মানুষের চিন্তার রাজ্যে ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়ে মানুষের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করে ঐ সংশোধিত চরিত্রের লোকদের দ্বারা পৃথিবীর বুকে ইসলামী বিধিবিধান বাস্তবায়িত করতে চায়। জামায়াতের এ চাওয়া নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) গণ উল্লেখিত উপায়েই বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন এবং ঘটিয়েছেন। যেহেতু নবী আর আসবে না, সেহেতু শেষ নবী (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং প্রতিটি নবী (আঃ) গণ যা চেয়েছেন জামায়াত শিবিরও তা-ই চাচ্ছে, এ চাওয়া নতুন কিছু নয়। এ চাওয়া চির পুরাতন এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ চাওয়ার শেষ হবে না। এখানে আবার উল্লেখিত কথার কেউ অপব্যাখ্যা করবেন না, যে জামায়াত শিবির অঘোষিতভাবে নবীর দাবী করে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করছে। কারণ এ দেশে তো ফতোয়াবাজদের অভাব নেই।

জামায়াত বিরোধিতার পটভূমি

বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিরোধিতা করা হচ্ছে এই কথা বলে যে, এরা পাকিস্তান আন্দোলন বা ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে, মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট করে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, জামায়াত প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী, এ সমস্ত কথা বলে জামায়াত শিবিরের শুধু বিরোধী তাই করছে না, কোন কোন নেতা- নেত্রী জামায়াত শিবিরের রক্ত নিয়ে হোলিখেলার জন্য তাদের অনুগত কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছে। এ সমস্ত অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্যেই এই বইটি লিখা। কিন্তু তার পূর্বে ঐ অভিযোগকারীদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জামায়াত যদি পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতাই করবে তাহলে কিছু সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ

www.pathagar.com

মওলানা সাহেবেরা ইসলামের সামগ্রীকরূপ দর্শনে ব্যর্থ হয়ে কংগ্রেসের আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ সেজে কংগ্রেসের পক্ষে "হিন্দু মুসলমান একজাতি" এ ফতোয়া দিয়ে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা আন্দোলন তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করছিলেন তখন জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মওদুদী (রহঃ) এর "মাছলায়ে কওমিয়াত" (বাংলা অনুবাদ- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ।) বইটি মুসলিমলীগ নিজ খরচে লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে মানুষদের মধ্যে বিনা পয়সায় বিতরণ কেন করেছিল? পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে ইমাম মওদুদী (রহঃ) কে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে পাকিস্তান সরকার কেন আমন্ত্রণ জানাতো? ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মওলানা মওদুদী (রহঃ) কে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে জিহাদের উপর বক্তৃতা করে গোটা জাতিকে ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদে অনুপ্রাণিত করার জন্যে পাকিস্তান সরকার কেন আমন্ত্রণ জানাতো? প্রকৃতপক্ষে ইমাম মওদুদী (রহঃ) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবেশে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, আজ যারা মুসলমানদের ইসলামী রাষ্ট্র দিবেন বলে মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাচ্ছে, তাদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম অসম্ভব। কারণ এই অন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের ব্যক্তি চরিত্রে যেমন পূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন নেই তেমনি তারা ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির কোন কর্মসূচীও গ্রহণ করেনি। সুতরাং এদের দ্বারা মুসলমানরা এটি আলাদা ভূখন্ড পেতে পারে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র পেতে পারে না।

বরং শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত জনপ্রিয় নেতাদের কোন কোন কর্মকান্ড কিছু মানুষের কাছে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী বলে মনে হয়। এ, কে, ফজলুল হকের মত নেতা যিনি ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবের প্রস্তাবক ছিলেন, যে লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান অন্দোলনের গোড়া পত্তন ঘটিয়েছিল, তিনিই ১৯৪৬ সনে পাকিস্তান ইস্যুতে যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে পাকিস্তান অন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করেন। পাকিস্তান হওয়ার পরে অবশ্য তারা উভয়েই পাকিস্তানের মন্ত্রীত্ব লাভকরেন।

১৯৪৬ সনে লখ্‌নোতে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে জনসভা হচ্ছে, জনসভায় সভাপতিত্ব করছেন মর্দ্দে মুজাহিদ মওলানা শাব্বির আহম্মদ ওসমানী

www.pathagar.com

(রহঃ), সভার প্রধান বক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। সমবেত জনতা জিন্নাহ সাহেবকে প্রশ্ন করলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা কি পাবো? জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত চালাক মানুষ ছিলেন, তিনি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, এ প্রশ্নের জবাব দিবেন আজকের সভার সভাপতি মওলানা শাব্বির সাহেব। মওলানা শাব্বির আহ্‌মেদ ওসমানী (রহঃ) তখন দাঁড়িয়ে তার ডান হাতটি পিছনে রেখে বাম হাতের তর্জনী নেড়ে বললেন, আপনারা প্রশ্ন করেছেন, পাকিস্তান হলে আমরা কি পাবো? পাকিস্তান হলে আপনারা এই পাবেন। এ কথা বলে মওলানা ওসমানী (রহঃ) তার ডান হাতটি পিছন থেকে সামনে এনে উঁচু করে ধরলেন, তার ডান হাতে ছিল পবিত্র একজেল কোরান শরিফ। কোরান দেখে সমবেত জনতা গগন বিদারী শ্লোগান দিয়ে রাজপথে নেমে পড়লো।

শ্লোগানটি ছিল,

কানমেঁ বিঁড়ি মু মেঁ পান
ল্যড়কে লেংগে পাকিস্তান।

ইমাম মওদুদী (রহঃ)– এর কথা যে কত বাস্তব ছিল পাকিস্তানের দীর্ঘ দুই যুগের ইতিহাস তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতা তো করেইনি বরং সর্বান্তকরণে পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে। নবীদের আমল থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর যেখানেই ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে সেখানেই তিন শ্রেণীর শক্তি এই আন্দোলনের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তিন শক্তি সম্পর্কে বইটির শেষ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়ীকতা প্রতিক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং যে কারণে তিন শক্তি (ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠি, সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও সমসাময়িক রাষ্ট্র শক্তি) নবীদের সাথে বিরোধিতা করেছে, ঐ একই কারণে জামায়াত শিবিরের সাথে বিরোধিতা করা হচ্ছে। নবীদের আন্দোলনের সাথে বিরোধিতার পটভূমি এবং এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতার পটভূমি ঐ একই সূত্রে গাঁথা।

১৯৭১ –এ জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা

৭১–এ জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার পূর্বে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা জামায়াত ৭১–এ পাকিস্তানের

www.pathagar.com

অখন্ডতা রক্ষা করার সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করলো, সে সম্পর্কে এ উপমহাদেশের ইতিহাস না জানলে বিষয়টি পরিষ্কার হবেনা। বর্ণবাদী হিন্দুদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ভারতীয় উপ-মহাদেশের সাধারণ হিন্দুরাই মুসলমানদেরকে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানিয়েছিল। দীর্ঘ ৬০০ (ছয়শত) বছর মুসলমানরা এদেশ শাসন করে। তাদের শাসনে পরিপূর্ণ ইসলাম না থাকলেও ইসলামের স্পর্শ কিছুটা ছিল বলে অমুসলিমরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকদূর এগিয়ে যায়। মুসলমান শাসকদের উদারনীতির ফলে অনেক অমুসলিমরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে। এক শ্রেণীর হিন্দুরা চানক্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী হওয়ার কারনে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়ীক মানসিকতার জন্ম নেয়। আর তখন থেকেই ঐ চানক্যবাদীরা মুসলিম শাসকদের পতন ঘটিয়ে এ উপমহাদেশ থেকে ইসলামকে বিদায় করে দেবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র শুরু করে। বর্তমানেও ভারতের বি, জে, পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা, বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের কর্মকান্ড বিচার বিশ্লেষণ করলে উল্লেখিত কথার সততা পাওয়া যাবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার উদারনীতির কারণে ষড়যন্ত্রকারীরা মীর জাফর আলী খাঁনকে সামনে শিখন্ডীর মত দাঁড় করিয়ে বৃটিশদের সাহায্যে মুসলমানদের পতন ঘটাতে আরম্ভ করে।

এ কথা ইতিহাসে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশই ছিল বর্ণবাদী হিন্দু। অনেক প্রখ্যাত হিন্দু নেতাদের কথা আলোচনা না-ই বা করলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। কারণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যারা সব ধরনের জাতি ভেদের উর্ধ্বে মনে করেন, অসাম্প্রদায়ীক মনে করে হিন্দুয়ানী কায়দায় মংগল ঘট সাজিয়ে রীতিমত তার পূজা করে চলেছেন খোল করতাল বাজিয়ে, (কবি সুফিয়া কামাল তো রবীন্দ্র সংগীত গাওয়াকে ইবাদত মনে করে গোটা জাতিকে এই ইবাদতে (?) শামিল হওয়ার জন্যে মুফতিয়ে আযম সেঁজে ফতোয়া দিয়েছেন) তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা নিয়ে আলোচনা করছি। যাদের কাছে তিনি বাংগালী সংস্কৃতির গুরু সেই গুরু মশাই ইংরেজদের কিভাবে পদ চুম্বন করেছেন দেখুন।

জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।

www.pathagar.com

পাঞ্জাব সিন্দু গুজরাঠ মারাঠা দ্রাবিড় উৎকুল বংগ . . .
দারুন বিপ্লব মাঝে তব শংখ ধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ ত্রাতা
. . . . . .
স্নেহময়ী তুমি মাতা . . . . .
তব চরনে নত মাথা . . . . . .
জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয়, জয়হে।।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে এই কবিতাটি দিল্লীতে পাঠ করা হয় বৃটিশ রাজকে ভারত বিধাতা সম্বোধন করে। ১৯১১ সনে এ অনুষ্ঠানেই ১৯০৫ সনে গঠিত নতুন প্রদেশ পূর্ববংগ ও আসাম ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী বাতিল ঘোষিত হয় রবিন্দ্র বাবুদের ষড়যন্ত্রে। বংগভংগ রদ তথা নতুন প্রদেশ বাতিলের ফলে (বর্তমানে বাংলাদেশ সহ) নতুন প্রদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির আশা পদদলিত করা হয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হয় যে অনুষ্ঠানে, আর সে অনুষ্ঠানে বাংগালী গোশাই ঠাকুরের কবিতা আনন্দের হিল্লোল আনে।

আজন্ম বিলাসীতায় মগ্ন রবীন্দ্র বাবু মুসলমানদের কোন্ চোখে দেখতেন তার কিছু নমুনা দেখুন, রবী বাবুর "বন্দীবীর" কবিতার কিছু অংশ।

মোগল শিখের রনে
মরণ আলিংগনে
কণ্ঠে পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুই জনা দুইজনে
দংশ্যনক্ষত শ্যান বিহংগ যুজে ভুজংগ সনে
সেদিন কঠিন রনে
"জয়গুরুজীর হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্ত পাগল দীন, দীন, গরজনে"

রবীন্দ্র পুজারীদের আরধ্য দেবতা রবী বাবুর দৃষ্টিতে শিখরা অমিত তেজী বীর। আর মুসলমানেরা "মত্তমোগল রক্ত পাগল"। অথচ ঐ শিখদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের ও তাদের সহযোগীদের হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে ১৮৩১ সনে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের সীমানায় বালা কোঠের ময়দানে সাইয়েদ আহামদ ব্রেলভী (রহঃ) ও শাহ ইসমাইল (রহঃ) কে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করছিলেন।

রবী বাবুর কানে আসে শিখদের চিৎকার "জয়গুরুজী" আর মুসলমানের "গরজন" তার কানে আসে দীন্ দীন্"। জ্ঞান পাপী আর কাকে বলে! মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণাও আছে তারা অবশ্যই মুসলমানদের প্রাণের ধ্বনী "আল্লাহ আকবার" এর সাথে পরিচিত। শুধু যুদ্ধে ক্ষেত্রে নয় মুসলমানরা মিছিল শোভাযাত্রাতেও একমাত্র আল্লাহু আকবার ধ্বনীই দিয়ে থাকেন। রবী বাবুর ভাষায় "দীন্ দীন্ "চিৎকার নয়।

রবী বাবুর হোরিখেলা কবিতা দেখুন,

পত্রদিল পাঠান কেশর খাঁরে
কেতুনহতে ভুনাগ রাজার রানী,
লড়াই করি আশ মিঠিছে মিয়া?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া–
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী,
যুদ্ধে হারি কোঠা শহর ছাড়ি
কেতুন হতে পত্র দিল রানী"
পত্রপড়ি কেশর উঠে হাসি,
মনের সুখে গোঁফে দিলা চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ী পড়ে মাথে,
সুরমা আকিঁ দিল আঁখির পাথে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া
পাঠান সাথে হোরি খেলবে রানী
কেশর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।।

এ জাতীয় অনেক কবিতাতেই ররীন্দ্রনাথ বাবু মুসলমানদের প্রাণভরে বিদ্রুপ করেছে। সাম্প্রদায়ীক মানসিকতা নিয়ে ভুনাগের রানীকে দিয়ে পাঠানোর কাছে প্রেমপত্র পাঠিয়েছেন রবী বাবু। কেশর খাঁকে সাজিয়ে মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। আর পাঠান সেনাপতি কেশরখাঁ যুদ্ধনীতির যাবতীয় সর্তকতামূলক ব্যবস্থা পরিহার করে বিন্দুমাত্র সন্দেহও না করে হিন্দু নারীর যৌবনে উম্মাদ

www.pathagar.com

হয়ে হোরি খেলতে চলে গেলেন, রবী বাবু এটাই আমাদের বুঝিয়েছেন। আসলে মুসলমান সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনলে যাদের রাজা–মহারাজা সাপের ঝুড়ীর মধ্যে বসে, পেছনের দরজা দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে তারা এভাবেই পত্র পত্রিকা কবিতা সাহিত্যে আত্মপ্রসাদ লাভ ছাড়া কি–ই–বা করতে পারেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিবাজী উৎসব" কবিতা দেখুন,

কোন দূর শতাব্দীর কোন এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে অরন্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজী
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি
এক ধর্ম রাজ্যে পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিত ভারত
বেঁধে দিব আমি,
. . . . . .
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যুবলি করে পরিহাস
অটট্ হাস্য রবে।
তবপূন্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে
. . . . . ,,,,,
তোমারে চিনেছি, আজি চিনেছি হে রাজা,
তুমি মহারাজ
তব রাজ কর লয়ে আট কোটি বংগের নন্দন
দাড়াইবেআজ
সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ
শিরপতি লব
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যান মন্ত্রে তব
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দারিদ্রের বল
"এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন

www.pathagar.com

করি সম্বল
মারাঠির সাথে আজি, হে বাংগালী এক কণ্ঠে বল
'জয়তু শিবাজী'
মারাঠির সাথে আজি, হে বাংগালী এক সংগে চল
মহোৎসবে সাজি
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিমে পূর্ব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এ পুন্য নামে–

মারাঠা দস্যুরা বর্গী নামে পরিচিত। ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে· বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কে– সে? এই ছড়াটির সাথে মারাঠি বর্গীদের অত্যাচারের নির্মম কাহিনী ইতিহাসে আজও বিভীষিকার মত বিদ্যমান। আর এই মারাঠা দস্যুরাজ শিবাজী ছিল সম্রাট আলমগীর আওরংগজেবের ঘোর শত্রু। শিবাজী বাবু সন্ধিস্থলে বিজাপুরের সুলতান আফজল খাঁনকে "বাঘনখ" নামক অস্ত্র দিয়ে অত্যন্ত পৈচাশিকভাবে হত্যা করে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানদের পরাজয় এবং বৃটিশদের বিজয়কে দেখেছেন, তার ভাষায়ঃ–

সে দিন এ বংগ প্রান্তে পন্য বিপণীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বনিক লক্ষীসুর, পথের অন্ধকারে
রাজ সিংহাসন
বংগ তারে গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে
বনিকের মানদন্ড দেখাদিল পোহালে শর্বরী
রাজদন্ডরূপে।।

বৃটিশ বোনিয়াদের বিজয়কে জমিদার রবীন্দ্র বাবু
রাত্রি (শর্বরী) পোহানোর সাথে তুলনা করেছে।

কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তার কবিতায় ইংরেজ লুঠেরাদের পায়ে অবনত মস্তকে চুমো দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। এদেশের মুসলমানদের তিনি বিদেশী বলে

www.pathagar.com

আখ্যায়িতই শুধু করেননি, ডাকাত ও তস্করও তিনি বলেছেন। গোটা ভারত ব্যাপি তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের জয়-জয়কার দেখতে চেয়েছেন। এদেশের সকল জাতিকে তিনি হিন্দু ধর্মে বিলীন করে দিয়ে রামরাজত্বের স্বপ্ন দেখেছেন। মুসলমানদের তিনি বাংগালী বলে স্বীকারও করেননি।

তাহলে যারা বাংগালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, তাদেরকে ভারতের গোলাম ছাড়া আর কি-ইবা বলা যায়? দাদা বাবুদের ষড়যন্ত্রের কারণে ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য প্রায় দুইশত বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল। এ সময়ে হিন্দুদের কোন ক্ষতিই হয়নি, এদেশের স্বাধীনতা হরণকারী ঐ বৃটিশদেরই একজন ডব্লিউ হান্টার কর্তৃক লিখিত দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স নামক গ্রন্থে মুসলমানদের যে করুন চিত্র তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। হান্টার সাহেবের গ্রন্থ থেকে একটি মাত্র উক্তিই তুলে ধরছি, তাহলে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা অনুমান করা যাবে। হান্টার লিখেছেন, "কলিকাতার সরকারী কোন অফিসেই মুসলমানগণ চাপরাশী, দারোয়ান ও পিয়নের উর্ধ্বে চাকুরী পাওয়ার আশা করিতে পারিত না"।

সুতরাং ক্ষতি যা হবার মুসলমানদেরই হয়েছে বৃটিশ বেনিয়াদের কারণে। জড়বাদী হিন্দু সম্প্রদায় মারাত্মক ধরনের ক্ষতির উর্ধ্বে থেকে গেলেন। কারণ তারা মনে করেছিলেন এতকাল আমাদের শাসন করেছে মুসলমানেরা আর এখন করবে ইংরেজরা, এতে আমাদের ক্ষতি নেই, বরং প্রভু বদল হয়েছেন মাত্র।

আর মুসলমানদের রাজ্য গেল, চাকুরী গেল, মর্যাদা গেল, অর্থ-বিত্ত গেল, গেল প্রভাব প্রতিপত্তি। এক কথায় সবই গেল। এরা ছিল শাসক জাতি হয়ে গেল শাসিত। ইতিহাস এখানেই শেষ নয়, স্বাধীন চেতা কিছু হিন্দু নেতা মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে তখনও ঐ জড়বাদী সম্প্রদায়ের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে নস্যাত করে দেয়। মানসিংহ নামে এক হিন্দু প্রধান তান্ডিয়া টোপীকে ইংরেজদের হাতে ধরে দেবার ব্যবস্থা করে। পরে ইংরেজরা তান্ডিয়া টোপীকে ফাঁসিতে ঝুলায়। সম্রাট বাহাদুর শাহের যিনি সেক্রেটারী সেই মুকুন্দলালও ছিল ইংরেজদের দালাল। আজকে যে ইসলাম পন্থীদের স্বাধীনতা বিরোধী বলা হচ্ছে সেই ইসলামের বীর সেনানী আলেমরাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেন। ঐ সময় দেশের

www.pathagar.com

আলেম সমাজ স্বাধীনতা যুদ্ধে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করেন, সংগ্রামের প্রচারনা, সংগঠন ও সেনাপতিত্ব প্রায়ই আলেমদের দ্বারায় পরিচালিত হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর হিন্দুরা সাধু সেজে সংগ্রামের সব দোষ মুসলমানদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে।

সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল আলেম সম্প্রদায়, কাজেই তাঁদের ওপরই নেমে এলো কঠোর নির্যাতন। ইংরেজ ও বর্ণবাদী হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে হাজার হাজার আলেমকে বিচারের নামে প্রহসন করে প্রকাশ্যে গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হলো, অগণিত ইসলামী চিন্তাবিদকে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হলো। অগণিত মুসলিম বীর সেনানীকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছে, লাশগুলি দিনের পর দিন ঐ অবস্থাতেই থেকেছে, পচে গলে নষ্ট হয়েছে, শিয়াল শকুনে খেয়েছে দাফন কাফনের কোন ব্যবস্থাও করতে দেয়নি বিশ্বাসঘাতকেরা। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক সহ উপমহাদেশের অনেক স্থানই ঐ বিষাদময় স্মৃতি নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে আছে। ইংরেজদের হাতে হাত মিলিয়ে বিশ্বাসঘাতকেরা মুসলমানদের জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

বিধাতার নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস, দেশের যারা স্বাধীনতা চাইলেন অমুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে তারা হলেন সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহী, শোষণের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ালেন তারা হলেন মৃত্যুদন্ডের আসামী, ইসলামকে যারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তারা হলেন সাম্প্রদায়ীক। আর মুসলমানদের চরম শত্রু সন্ত্রাসী ক্ষুদিরাম ও ডাকাত সূর্য্যসেনকে তারা বানালেন স্বাধীনতার নায়ক। অদৃষ্টের পরিহাস। বীরের জাতি হলো অধঃপতিত শাসক হলো ভুলুণ্ঠিত, ইতিহাসের নায়কগণ যবনিকার অন্তরালে আর কাপুরুষেরা তাদের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা মসীবর্ণ করে দিতে শুরু করলো এবং অমুসলিম ঐতিহাসিকরা মুসলিমবীরদের স্থান দিল ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। ইংরেজ প্রভুদের মনোরঞ্জন করার জন্য হিন্দুরা প্রতিযোগীতায় নেমে পড়লো মুসলিমদের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে বীরকে ভীরু সাজিয়ে আর দেশ দ্রোহী কাপুরুষকে বীর বেশে সাজিয়ে কত রঙের খেলাইনা হিন্দুরা খেললো। জড়বাদী হিন্দু ও বিশ্বাস ঘাতক ইংরেজরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক ঘৃণ্য তৎপরতা শুরু করলো যে, মুসলমানী রীতি–নীতি, পোষাক–পরিচ্ছদ, নাম–ধাম, পদবী কিছু সময়ের জন্যে হেয় প্রতিপন্ন হলো। আলেম সমাজকে সমাজে বানানো হলো উপহাসের পাত্র। কোরান

www.pathagar.com

হাদিসের অমর্যাদা করা হলো। নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন করে সাহিত্য রচনা করলো হিন্দুরা। মুগলদের বড় বড় পদবীধারী ব্যক্তিবর্গ সমাজে অচল মুদ্রা হয়ে পড়লেন, নবাবী পোষাক উঠলো দারোয়ানদের গায়ে আর বাদশাহী আমলের খান-ই সামান "খানসামায়" রূপান্তরিত হয়ে হিন্দু, ইংরেজ অফিসারদের হুকুমবরদার ভৃত্যে পরিণত হলো। উল্লেখিত ইতিহাস সামনে রেখে এবার ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সেই ইতিহাস নিয়ে কিছুটা আলোচনা না করলে ৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। সুতরাং ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত ইতিহাস সম্পর্কে তারা অবশ্যই অবগত আছেন যাদের বয়স ৬০ বা তার উর্ধ্বে এবং রাজনীতি সচেতন। তারা তো নিজ চোখেই সব কিছু দেখেছেন।

১৯৪৭ সনের বহু পূর্বেই ইংরেজ ও হিন্দুরা জানতো যে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা যাবেনা, এদেরকে স্বাধীনতা দিতেই হবে, এদেরকে আলাদা ভূখন্ড দিতে হবে। তাই দাদা বাবুরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের পদলেহী একটি গোষ্ঠী তৈরী শুরু করলেন।

ঘটনা যদি সত্যই না হবে তাহলে ১৯০৫ সনে যখন বংগভংগ আন্দোলন শুরু করলেন বাংলার মুসলমানেরা তখন হিন্দুরা হিংস্র হায়েনার রূপ ধারণ করেছিল কেন? খোদ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বংগভংগ রোধ করার জন্যে রাস্তায় কেন নেমেছিলেন? ইংরেজদের পায়ে চুমো দেওয়ার কারণে যে ইংরেজরা তাদের অনুগত ভৃত্য রবী ঠাকুরকে "নাইট" উপাধি দিয়েছিল আর ঠাকুর মশাই সে "নাইট" কে কেন বর্জন করলো? এর পিছনে কি কারণ ছিল।

কারণ তো মাত্র একটাই ছিল যে, ভবিষ্যতে মুর্সলমানদের স্বাধীনতা যখন আমরা দেব তখন যেন মুসলমানেরা স্বাধীন ভূখন্ডে থেকেও হিন্দুদের গোলামী; করতে বাধ্য হয়। আর সাধারণ মুসলমানদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদের দাসে পরিণত করার জন্যে এবং স্বাধীন মুসলিম দেশকে হিন্দুদের কলোনী ও লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত করতে হলে কিছু অনুগত বাহিনী সৃষ্টি প্রয়োজন। সে বাহিনী আমরা এখনো পুরোপুরি সৃষ্টি করতে পারিনি। অতএব প্রভু ইংরেজ, এখন যদি বংগভংগ কর তাহলে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে না, কিছুদিন পরেই বাংলা ভাগ কর।

www.pathagar.com

যে বংগভংগ রদ করার জন্যে হিন্দুদের এত তোড় জোর আর সেই বাংলাকেই তারা ১৯৪৭ সনে এসে যখন ভাগ করে ফেলল তখন উল্লেখিত কারণ সত্য বলে ধারণা করতে মুসলমানেরা বাধ্য হয় এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যা ঘটলো তা উল্লেখিত কথারই প্রমাণ বহন করে। ভারত যখন অনুগত বাহিনী মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো তখই তারা বাংলা ভাগ করলো এবং পাকিস্তান স্বাধীন হলো।

যে দ্বিজাতি তত্ব (টু নেশন থিউরী) তথা ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো সেই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে পারতো একমাত্র ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে ইসলামের শত্রু ভারতীয়রা পাকিস্তানকে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করলো ইসলাম বিবর্জিত পন্থায়। যাতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা জানতেও না পারে কিসের ভিত্তিতে পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছিল। তদুপরি চোরা পথে ইসলাম বিরোধী পত্র-পত্রিকা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী করে এদেশের তরুণ-যুবকদের মস্তক ধোলাই আরম্ভ হলো যে, তোমরা এখন আর মুসলমান জাতি নও। তোমরা বাঙ্গালী জাতি। এভাবে করে ইসলামের শত্রুরা পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম যুবক-তরুণদের বিভ্রান্ত করে পাকিস্তান বিরোধী মানসিকতা করে তুলবার চেষ্টা শুরু করে।

ইসলামের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে স্থান দখল করে সে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন ছিল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার, যে শিক্ষা পাকিস্তানের নতুন প্রজন্মদেরকে শিক্ষা দিত, কিসের ভিত্তিতে এবং কোন উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারী তপ্ত রক্ত দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রচিত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী না করে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী হলো ধর্ম নিরপেক্ষ, আর এ শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল মুলতঃ বিশ্বের মানচিত্রের বাগান থেকে পাকিস্তান নামক সদ্য প্ররিস্ফুটিত গোলাপের পাঁপড়ী ঝরিয়ে দেওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা আর এই শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরীর পিছনেও ছিল মুসলিম নামধারী ভারতীয় চর তথা ইসলামের শত্রু-পাকিস্তানের দুশমনরা। ইসলামহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে একদিকে পাকিস্তানের নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতা পাকিস্তান তথা ইসলাম বিরোধী হিসাবে গড়ে উঠলো অপরদিকে

www.pathagar.com

ইসলামের চরম শত্রু কমুনিষ্ট এবং ভারতীয় দালালরা পাকিস্তানের তরুণ–যুবকদের মধ্যে ভাষাগত বিরোধ সৃষ্টি করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন করলো। যে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে, সেই আওয়ামী লীগ হয়ে গেল ইসলামের দুশমন।

১৯৪৯ সনের ২৩ ও ২৪ শে জুনের সভায় আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল। সেটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন। খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরাম খাঁ, নূরুল আমীন, শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বাধীন" "পকেট মুসলিম লীগের" বাইরে "জনগণের মুসলিম লীগের" প্রতিষ্ঠার পক্ষেই জন্ম হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের নাজিম আকরাম গ্রুপের বিপরীতে।

সোহরাওয়ার্দী–হাশিম নামের সক্রিয় শক্তিশালী গ্রুপটিই আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মি ভিত্তি দান করেছিল বলে বাংলাদেশ পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃ–কর্মী বাহিনীর সক্রিয়তর অংশই সেদিন আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল জনাব ভাসানী। বর্তমানে কেউ কেউ শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রচার চালায়, যা ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা। এমনকি যে সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় সে সম্মেলনে শেখ মুজিব নিজে উপস্থিতও ছিল না। জনাব ভাসানী ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা–সভাপতি, আর সহ–সভাপতি ছিলেন জনাব আতাউর রহমান খাঁন, আব্দুস সালাম খাঁন ও আবুল মনসুর আহমদ এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মরহুম শামছুল হক। শেখ মুজিব ও খন্দকার মোশতাক ছিল কমিটির সহ–সম্পাদক। ক্রমান্বয়ে ইসলামের শত্রু রুশ, ভারত, চীন আমেরিকার চররা আওয়ামী লীগে দলে দলে প্রবেশ করে দলটির আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য বিসর্জন দিয়ে ইসলামকে দূরে ছুড়ে দিয়ে রবী বাবুদের ব্রহ্মাণ্যবাদ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করে আওয়ামী মুসলিম লীগের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ হয়ে গেল। এদেশের মানুষের আবেগ উচ্ছাসের গোড়ায় পানি ঢেলে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জোয়ার সৃষ্টি করে ক্ষমতায় যাওয়ার সহজ পথ সৃষ্টি করলো। ভারতও সর্বদিক দিয়ে আওয়ামী লীগকে গোপনে সহযোগীতা করতে থাকে যা এদেশের ইসলাম পন্থীদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন "আমার

www.pathagar.com

সোনার বাংলা· · · · ওমা তোর বটের মূলে" সংগীতটি আওয়ামী লীগ এদেশের মুসলিম তরুণ যুবকদের মুখে তুলেদিল। এদেশের ইসলাম পন্থীরা এ কথা খুব ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আওয়ামী লীগ এদেশের মুসলমানদেরকে পুনরায় হিন্দুদের গোলামে পরিণত করতে চায়। পিন্ডির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিল্লীর দাসে পরিণত করতে চায়। তবুও ১৯৭০ সনের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয়ী দলের নেতা– জনাব শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্যে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বার বার পত্র–পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে জোর দাবী জানাতে থাকে। এটা জামায়াতে ইসলামীর গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বোধেরই পরিচয় বহন করে। শুধু তাই নয়, আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ বে–আইনী ঘোষিত না হয়ে বে–আইনী ঘোষিত হলো ১৯৬৪ সনের জানুয়ারীতে জামায়াতে ইসলামী। দীর্ঘ নয় মাস জামায়াতের ৬০ জন নেতাকে কারাগারের অন্ধপ্রকষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখা হলো। সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে আয়ুব শাহীর বে–আইনী ঘোষনাটি বাতিল হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ– ধর্মহীন সমাজতান্ত্রিক চরিত্র দেখে এ দেশের ইসলাম পন্থীরা আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে একারণে যে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের উপরে ধর্মহীন সরকার কি কঠোর নির্যাতন চালাচ্ছে এবং ভারতে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত সরকারের সহযোগীতায় হিন্দুরা কি জঘন্য পন্থায় হোলি খেলছে। ১৯৭১ এ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছিল যে কয়টি কারণে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো, জামায়াত তার প্রতিষ্ঠা। লগ্ন থেকেই আদর্শচ্যুত না হয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপোষহীন আন্দোলন করে আসছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের হাতে হাত মিলিয়ে ভারতের সহযোগীতা নিয়ে পাকিস্তানকে ভাগ করার আন্দোলনে জামায়াত কিছুতেই শরিক হতে পারে না। আর পূর্ব থেকে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা তথা দেশ ভাগ করার কথাও জনগণকে বলেনি, তারা বলেছে স্বায়ত্ব শাসনের কথা– যদিও তাদের সাথে আগরতলায় ভারতীয় কাপালিকদের বৈঠক হয়েছিল পাকিস্তানকে ভাগ করার। পাকিস্তানকে ভাগ করার কথা যদি শেখ মুজিব পূর্বেই এদেশ বাসীকে জানাতো তাহলে এদেশের ইতিহাস অন্য রকম হতো। ভারত সরকার তথা হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি

www.pathagar.com

বিমাতা সুলভ আচরণের কারণে জামায়াতে ইসলামী হিন্দু ভারতকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের সহযোগীতায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশ হবে ভারতের করদ রাজ্য। বাংলাদেশের স্বাধীন রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্র নীতি বলে কিছুই থাকবে না। এদেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে ভারত কর্তৃক। এ অনুমান জামায়াত অনেক আগেই করেছিল, ফলে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা নিতে হয়েছিল জামায়াতকে। জামায়াতে ইসলামীর অনুমান যে কত বাস্তব ছিল যা আমরা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে এ পর্যন্ত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। জামায়াত মনে করতো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনেক বেশী, তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের হাতে ক্ষমতা আসবে, আর জনগণের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে তখন জনসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রভাব পড়বে বেশী। এ দৃষ্টিকোন থেকেও জামায়াত অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের আধিপত্য ও সম্প্রসারণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রভুক্ত থাকাই জামায়াত শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এ বাংলাদেশ হবে ভৌগলিক দিক দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত একটি দেশ। ফলে উঠতে বসতে বাংলাদেশকে ভারতের লাথি খেতে হবে। আর অখন্ড পাকিস্তান টিকে থাকলে ভারত একটু চিন্তা করেই পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করবে। তখন জামায়াত এটা অনুমান করেই অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। জামায়াতের অনুমান যে কত নির্ভুল ছিল তা আজ আর এদেশবাসীকে বোঝানোরঅবকাশ নেই।

ভারত অখন্ড পাকিস্তান থাকাকালীন অবস্থায় বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ ফারাক্কা চালু করে সাহস পায়নি। আর বর্তমানে শুধু ফারাক্কাই নয়, বিভিন্ন নদীর গতি পথে বাঁধ নির্মাণ করে বর্ষার মৌসুমে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে ও খরার মৌসুমে মরুভূমি বানিয়ে বাংলাদেশীদের মারার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশের যাবতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে বাংলাদেশকে ভারত তার ব্যবসার কলোনীতে পরিণত করেছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলতে দিচ্ছে না। সীমান্তে বিডিআর সহ সাধারণ

www.pathagar.com

নাগরিকদের ভারত হত্যা করছে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি করে সীমান্ত এলাকার মানুষদের জীবন অতীষ্ঠ করে তুলছে। দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, বেরুবাড়ী তাপলপট্টি জবর দখল করে রেখেছে। বাংলাদেশের গোয়েন্দা অফিসারের গায়ে ভারতের দূত মুচকুন্দ দূবে হাত উঠিয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ যুবককের চরিত্র ধ্বংস করার জন্যে সর্বনাশা হিরোইন, অশ্লিল পত্র-পত্রিকা, কুরুচিপূর্ণ ছায়াছবি, শিক্ষাংগনে অস্ত্র সরবরাহ করে গোটা জাতিকে পংগু করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পথে-ঘাটে ভারতীয় শাড়ী লুঙ্গি ও বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রীর প্লাবণ বইয়ে দিয়ে এদেশের অর্থনীতির মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। আর বাংলাদেশীরা বর্তমানে নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

সূতরাং আওয়ামী লীগের পেছনে ভারতীয়রা ১৯৭১ সনে যখন কাতার বন্দী হয়ে দাড়িয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে, তখন জামায়াতে ইসলামী প্রকৃতই অনুধাবন করতে পেরেছিল পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেলে এ দেশের অবস্থা কি দাঁড়াবে? ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মুসলমানদের পৌত্তলিক বানাতে ভারত বাধ্য করবে। তার প্রমাণ বাংলাদেশ হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের অর্থ-শোষণ করে মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী কোরান সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগদের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে এক শ্রেণীর পাঞ্জাবী দানবদের অস্ত্রের খোরাকে পরিণত করে ভারতের হোটেলে মদ মেয়ে নিয়ে বিলাসী জীবনের চেয়ে এদেশের জনগণের সাথে ইমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করাটাই অধিকতর শ্রেষ্ঠ মনে করেছে।

সূতরাং ১৯৭১ সনে জামায়াতের ভূমিকা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বিজ্ঞজনোচিত ছিল। বর্তমানে ১৯৭১ সনে জামায়াতের ভূমিকার সাথে একাত্মতা পোষণ করে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জামায়াতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশকে একটি শোষণহীন নিরাপত্তাপূর্ণ সুখী সমৃদ্ধশালী ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে জানমাল কোরবাণী দিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে। ১৯৭১ সনে জামায়াতের ভূমিকার সমর্থনে শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধারাই নয়, মুক্তি যুদ্ধের সেক্টর কমান্ডাররাও পরিশ্রম করে বই লিখে সমর্থন জানিয়েছে।

বর্তমানে তরুণ যুবক অবাল বৃদ্ধবনিতা তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিচ্ছে তাতে করেও এ কথা প্রমাণ হয় যে, ৭১-এ জামায়াতের সিদ্ধান্তই ছিল নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা বাংগালী

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদের ধোয়া তুলে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে চেয়েছে, তাদের যে উদ্দেশ্য খারাপ ছিল সেটা আজ দেশবাসীর কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। ভারত যে উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল সে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ সফল হয়নি বলে বর্তমানে তথাকথিত শান্তি বাহিনী দিয়ে এ দেশের সরকারকে উত্যক্ত করছে এবং বংগভূমি আন্দোলনের নামে এই ছোট দেশ, বাংলাদেশকেও টুকরো টুকরো করে দেবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

বাংলাদেশে জামায়াত শিবিরের ভূমিকা

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের সাথে একত্রিত করার স্বপ্ন দেখার কোন অবকাশই নেই। সীমান্তের দিক দিয়ে যদি পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের পাশে হতো তাহলে একথা তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যেত যে, জামায়াত শিবির বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাথে কেন্দ্রিভূত করতে চায়।

ভৌগলিক জ্ঞান যাদের আছে তারা নিশ্চয়ই জানেন পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব কত। জামায়াত শিবির বাংলাদেশকে পুনরায় "পূর্ব পাকিস্তানে" রূপান্তরিত করতে চায় এ কথা যারা বলেন তারা ভৌগোলিক শাস্ত্র অনুধাবন করেই শুধুমাত্র ইসলাম ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এই কথা বলে জাতিকে বিভ্রান্ত করতে চায়।

যে উদ্দেশ্যে নিয়ে জামায়াত শিবির গঠিত হয়েছে, জামায়াত শিবির সে লক্ষ্য পানে কঠিনতম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও এগিয়ে যাচ্ছে। এদেশের মুসলমানদের প্রাণের স্পন্দন, বাংলার জমিনে আল্লাহর রহমত, এ জাতির অন্ধকারের একমাত্র আলোক বর্তিকা, ইসলামী আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য তরুণ-যুব কাফেলা, "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র-শিবির" ছাত্র সমাজের মধ্যে খোদাভীরুতা, সৎ নেতৃত্বের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শত বাধা প্রতিকুলতা পাড়ি দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের তরুণ-যুবক ছাত্র সমাজ যদি সঠিক সৎ নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আগামী দিনে জাতিকে পথ দেখাবে কে? ছাত্র শিবির নবী (দঃ)-এর সাহাবাদের চরিত্রের মত চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, যাতে করে আজকের ছাত্র-সমাজ তথা আগামী দিনের নেতৃবৃন্দ সৎ গুণাবলী সম্পন্ন হয়। ছাত্র শিবিরের কোন সাথী সদস্য যদি ইচ্ছাকৃতভাবে

www.pathagar.com

ইসলামের কোন বিধান লংঘন এবং তা সংগঠনের গোচরীভূত হলে সংগঠন তাকে আর সাথী বা সদস্য হিসাবে দেখে না, সাথী সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। এজন্যে এক কথায় বলতে হয় "শিবির" আদর্শ মানব তৈরীর কারখানা। অথচ এদেশের এক শ্রেণীর পত্র–পত্রিকা শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের কারণে শিবিরকে দায়ী করে শিবিরকে "রগকাটা বাহিনী" নামে জাতির সামনে মিথ্যা সংবাদ পেশ করে।

ইসলামী ছাত্র শিবির ছাত্র অংগনে ইসলামের কাজ করতে গিয়ে নিজের জীবন কোরবানী দিয়ে শাহাদাতের উজ্জল দৃষ্টান্ত যেমন স্থাপন করেছে তেমনি জামায়াতে ইসলামীও সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে গিয়ে জান–মাল কোরবানী দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী কৃষক শ্রমিক, দিনমজুর, তাঁতী, কামার–কুমার, জেলে, পুলিশ বিডিআর সেনাবাহিনী পেশাজীবী, চাকুরীজীবী, বুদ্ধিজীবী তথা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সৎ খোদাভীরু যোগ্য লোক সৃষ্টির জন্যে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করছে। সমাজ বা রাষ্ট্রে তথা নেতৃত্ব যদি অসৎ হয় তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সেই সমাজ বা রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের অশান্তি দেখা দেয়। জামায়াতে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সৎ মানুষ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অসৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনীতি যে কত কলুষিত হয় আমাদের দেশের রাজনীতিই তার বড় প্রমাণ। জামায়াত শিবির সর্বস্তরে আল্লাহকে ভয় করে এমন মানুষ তৈরী করছে। আপনাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে যে তরুণ–যুবক বৃদ্ধ তথা যে কোন বয়সের নারী–পুরষ যারাই জামায়াত শিবিরের সংস্পর্শে এসেছে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন তাদের পূর্ব চরিত্র এবং বর্তমান চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কি–না। যদি তারা জামায়াত শিবিরের সংগঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে তাহলে নিশ্চয়ই দেখবেন তাদের চরিত্রের সব দিক দিয়ে পরিবর্তন এসেছে এবং তারা ধীরে ধীরে আদর্শ মানবে পরিণত হচ্ছে। আপনাদের চোখের সামনেই জামায়াত বা শিবিরের কোন লোক যদি সরকারী প্রশাসনে থাকে তাহলে দেখবেন ঐ প্রশাসন কত গতিশীল।

বাংলাদেশে মানব সেবার ক্ষেত্রে জামায়াত যে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সহনশীলতার জন্ম দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। এদেশের শিক্ষাসংকট, রাজনৈতিক সংকটকালে জামায়াত শিবিরই সর্বপ্রথম নিঃশর্তভাবে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট কোন

www.pathagar.com

কোন সময় ইতিহাসের গতি ধারায় এমন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, জাতি গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়, এ ধরনের অনাকাংখিত সংকট উত্তরণে জামায়াত শিবিরই প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে। বর্তমানে এদেশবাসীর কাছে জামায়াত শিবিরের ভূমিকা আরও অধিক ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। যাদের মন মানষিকতা "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা" এমন মানষিক রোগে আক্রান্ত তারা কোন দিনই জামায়াত শিবিরের কর্মকান্ডকে ভালো বলবে না।

স্বাধীনতা বিরোধী কারা?

ইথারে গিতার দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে জামায়াত শিবির স্বাধীনতা বিরোধী। জামায়াতের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু শিবির তো প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে স্বাধীনতা লাভের প্রায় সাড়ে ছয় বছর পরে ১৯৭৭ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী। এই শিবিরকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে ঘোষণা দেওয়ার কারণ কি? যারা বর্তমানে শিবিরের সাথে জড়িত তাদের ৯৯% ভাগই ৭১ সনের পরে পৃথিবীর মুখ দেখেছে, এরা স্বাধীনতা বিরোধী হয় কেমন করে? আসলে ইসলামের শত্রুরা এদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে প্রতিহত করার পথ হারিয়ে "স্বাধীনতা বিরোধী" উপাধী দিয়েছে। ১৯৭১ সনের পরে জন্ম, নিয়ে ইমানের তাগিদে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই সমস্ত তরুণ-যুবক ইসলামের শত্রুদের রোষানলে পতিত হয়ে ইসলামের দুশমনদের হাতে নির্মমভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং শাহাদাত বরণ করছে। ইসলামের দুশমনরা কত পৈশাচিকভাবে শিবির কর্মীদের হত্যা করে যা হিংস্র বন্য হায়েনাকেও লজ্জা দেয়।

তথকাথিত স্বাধীনতা পন্থীদের উদ্দেশ্য যদি স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করাই হয়, তাহলে ঐ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার পরে যারা জন্ম নিয়েছে তারা, যারা ইসলামের কথা বলে, তাদেরকে কেন হত্যা করা হয়? মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত প্রাপ্ত শহীদানদের মাত্র একজনের নামই উল্লেখ করলাম, তিনি হলেন ৭১-সনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসলামী আন্দোলনের নেতা শাহবাজ উদ্দিন। তাকে ইসলামের শত্রুরা ঠান্ডা মাথায় তাদের নেত্রীর নির্দেশে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। এদের কাছে স্বাধীনতা বিরোধী বা স্বাধীনতা পন্থী বলে কোন কথা নেই, ইসলামের কথা যিনি বলবেন তিনিই এদের দৃষ্টিতে হয়ে যাবেন স্বাধীনতা বিরোধী। যারা দেশের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদের তো দৃষ্টি ভংগি এটাই হওয়া উচিত যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাধীনতার পক্ষে নিয়ন্ত্রণে রাখা। দেশের রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষনীতি সভ্যতা সংস্কৃতি আধিপত্যবাদী শক্তির প্রভাব মুক্ত রাখা। স্বাধীনতা অর্জন হয়তঃ বা সহজেই করা যায় কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করাটা অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব।

বাংলাদেশের যারা স্বাধীনতার দাবীদার তারা জনগণের রক্তের বিনিময়ে ক্ষমতা হাতে পেয়ে এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পক্ষে কি ভূমিকা পালন করেছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত কি ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে?

জামায়াতে ইসলামীর এমন কোন কর্মকান্ডে একথা প্রামাণিত হয় কি, যে কর্মকান্ড বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরোধী? বাংলাদেশের আসে পাশে এমন কোন মুসলিম দেশের অস্তিত্ব নেই যে দেশে গিয়ে জামায়াত শিবির নেতৃবৃন্দ আশ্রয় নিতে পারে বাংলাদেশে তাদের উপরে কোন বিপদ আসলে, এমনকি এদেশে এমন কোন দূতাবাসও নেই যে দূতাবাসের সকল কর্মকান্ড জামায়াতের প্রতি আন্তরিক বন্ধুত্বের পরিচয় বহন করে। সুতরাং জামায়াত শিবির তাদের নিজের স্বার্থেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখবে প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে।

স্বাধীনতার পরে জামায়াতে ইসলামী সহ ইসলামপন্থী সকল দল বে-আইনী ঘোষিত হয় সাংবিধানিকভাবে। পরবর্তীতে একমাত্র শেখ মুজিবের দল বাকশাল ব্যতিত সব দলই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পরে জামায়াত যখন আত্মপ্রকাশ করে, তার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জামায়াত এমন কোন কাজ বা বিবৃতি দিয়েছে কি, যা বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি? আমার চ্যালেঞ্জ রইলো সমস্ত রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের প্রতি, পারলে প্রমাণ করুন যে জামায়াত শিবির কোন দেশের লেজুরবৃত্তি করে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করে। যেহেতু জামায়াত শিবির নীতিচ্যুত হয় না সেহেতু জামায়াত আদর্শিক কারণেই এদেশকে প্রাণদিয়ে ভালবাসে। সত্যিকার দেশপ্রেম বলতে যা বুঝায় জামায়াতের মধ্যে তা পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

আসলে স্বাধীনতা বিরোধী কারা? যারা এদেশবাসীর চিন্তা-চেতনা ঈমান আকিদার পরিপন্থি আদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে আন্দোলন করে তারাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার শত্রু। কারণ এদেশের সংখ্যগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান, ইসলামে বিশ্বাসী। আর একমাত্র ইসলামই পারে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে। এদেশের মানচিত্র ঠিক রাখতে।

www.pathagar.com

যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মতাদর্শ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যে মতাদর্শ এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এক তাদের হাতে কি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা পেতে পারে? ভারত ও বাংলাদেশ যদি একই আদর্শের ভিত্তিতে চলে তাহলে এদেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেনাবাহিনী পালন করার কোন যুক্তিই থাকেনা। আলাদা মানচিত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না, আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে না, ভিন্ন মুদ্রার দরকার থাকে না, চিহ্নিত সীমান্ত রাখারও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। সভ্যতা সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার কোন প্রয়োজন থাকে না।

ভারতীয় আদর্শের তল্পীবাহক আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা ১৯৭১ সনে ক্ষমতা হাতে পেয়ে ভারতের কাছে কাবিন নামা লিখে দিয়ে এদেশের প্রতিটি বিভাগে ভারতের দাসত্বের শৃংখল লাগিয়েছিল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সহ তাদের সমমনা দলগুলির অধিকাংশ পদক্ষেপ বাংলাদেশের প্রতিকূলে, ভারতের অনুকূলে। বাংলাদেশে ভারতের দাস-দাসীদের প্রধান শেখ হাছিনা ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছে, "বাংলাদেশে মুসলমানরা হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করছে, হিন্দুরা দলে দলে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে"। ভারতমাতা প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর মানস কন্যা শ্রীমতি হাছিনা গান্ধী যখন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে উল্লেখিত কথাগুলি বলেছিল তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়ীক কাপালীক হিন্দুরা মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল। শেখ হাছিনা এমন কথাই সময় মত ভারতে বলে আসলো যাতে করে হিন্দুরা দ্বিগুণ উৎসাহে মুসলিম হত্যা যজ্ঞে মেতে উঠে। অথচ পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়ীক সম্প্রিতির উজ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি বাংলাদেশে আন্দোলনের নামে তরুণ-যুবকদের গুলির মুখে ঠেলে দিয়ে তার সন্তানদ্বয়কে নিরাপদ দূরত্বে ভারতের নৈনিতালে রেখে বাংলাদেশে ভারতের ভবিষ্যৎ দাস-দাসী হবার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ এতই ক্ষুদ্র আয়তনের যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে এদেশকে মানচিত্রে খুঁজে বের করতে। এত ছোট দেশটাকেও খন্ডিত করার ভারতীয় নীল নকশা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ও তাদের সমমনা দলগুলি কাজ করে যাচ্ছে। তার সামান্য কিছু প্রমাণ তুলে ধরছি। ভারত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তথাতথিত শান্তি বাহিনী দিয়ে অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ জনগণকে হত্যা করাচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে আর এদেশে ভারতের

www.pathagar.com

পদলেহী আওয়ামী লীগ ও তাদের সাংগপাংগরা এ ব্যাপারে ভারতকে দোষী বলতে সিরিয়াসলি নারাজ। এককালের আওয়ামী লীগ নেতা চিত্তরঞ্জন ও কালীপদ বাবুরা যখন লংমার্চ করে স্বাধীন বংগভূমি প্রতিষ্ঠিত করতে আসে বাংলাদেশে তখন এরা কচ্ছপের মত মাথা গুটিয়ে বসে থাকে। বংগভূমি হোতাদের কিছু লোকজনকে যখন সরকার গ্রেফতার করলো তখন আওয়ামী নেতৃবৃন্দই পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বংগভূমি আন্দোলনের পক্ষে ছাপাই গাইলো। বাংলাদেশের মরণফাঁদ ফারাক্কা চালুর অনুমতি ভারতকে আওয়ামী লীগই দেয়। তালপট্টি, দহগ্রাম, বেরুবাড়ী আংগর পোতার ব্যাপারে এরা ও এদের বুদ্ধিজীবীমহল অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে নীরবতা পালন করে। ভারত সৃষ্ট বন্যায় বাংলাদেশ যখন খাবি খায় তখন এরা ভারতের পক্ষ সমর্থন করে এদেশবাসীকে ভৌগলিক জ্ঞান দেয়। ভারত যখন ১৬ই ডিসেম্বরকে "পূর্ব পাকিস্তান বিজয় দিবস" হিসাবে পালন করে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তখন আওয়ামী লীগের পত্র-পত্রিকা ভারতের মানচিত্রের মধ্যে বাংলাদেশকে গায়েব করে দিয়ে শুধুমাত্র ভারতের মানচিত্র প্রকাশ করে। সুতরাং স্বাধীনতা বিরোধী কারা তা আর অধিক ব্যাখ্যা দিয়ে লিখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। স্বাধীনতার ছন্দাবরণে আওয়ামী লীগ ও তাদের সাংগপাংগরাই যে এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী তা এদেশবাসীর কাছে বর্তমানে প্রমাণিত সত্য।

জনগণের রায়ের প্রতি আওয়ামী লীগের বিশ্বাসঘাতকতা

জনগণের আন্দোলনের মুখে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ১৯৭০ সনে পূর্ব পাকিস্তানে যখন নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো তখন ইয়াহিয়া সাহেব একটি অধ্যাদেশ জারী করলেন যার নাম এল, এফ, ও, অর্থাৎ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার। যে অধ্যাদেশে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল, যে কোন দল নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় গিয়ে কোরান সুন্নাহর বিরোধী কোন আইন সংবিধানের অংগীভূত করতে পারবে না। আঃ হামিদ খাঁন ভাসানী এই অধ্যাদেশকে মেনে নিতে না পেরে নির্বাচন বর্জন করলেন। তদানিন্তন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খাঁন কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশ অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে নির্বাচনী জনসভায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে জনগণের কাছে ওয়াদা করলেন, ক্ষমতায় গিয়ে তিনি ইসলাম বিরোধী কোন কিছু করবেন না। জনগণ তাকে রায় দিল। পক্ষান্তরে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানে "পোড়ামাটি নীতি" অবলম্বন করলো। অবশেষে চরম ত্যাগ স্বীকার করে এদেশের জনগণ শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীকে বাধ্য করলো। শেখ মুজিব ক্ষমতা হাতে পেয়ে ইসলামের সাথে কি জঘন্য আচরণ করলেন তার বর্ণনা এই বইয়ের বিভিন্ন স্থানে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতো যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামকে এদেশ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করবে তাহলে জনগণ কিছুতেই আওয়ামী লীগকে ভোট দিত না, ইসলামের নাম ভাংগিয়ে ভোট নিয়ে জনগণের সাথে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসঘাতকতা করলো। বর্তমানেও নির্বাচন আসলে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নির্বাচনী পোষ্টার এ "বিছমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার" শব্দ ব্যবহার করে প্রকৃত ধর্ম ব্যবসায়ীরই পরিচয় দেয়। এরাই আবার প্রকৃত ধর্মপন্থীদেরকে ধর্মব্যবসায়ী নামে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালায়।

স্ববিরোধী চার মূলনীতি

ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইন সংবিধানে সংযোজন করবে না বলে ১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পূর্বে জাতির কাছে ওয়াদা করে এবং বর্তমানেও নির্বাচন আসলে তারা ইসলাম বিরোধী নয় বলে জনগণের সামনে জাহির করে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শ কি? তাদের দলীয় আদর্শ হলো, (২) সমাজতন্ত্র (২) গণতন্ত্র (৩) বাংগালী জাতীয়তাবাদ (৪) ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ। এই চার মূলনীতি যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করা যাক। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে এই বইতে শেষের দিকে বিস্তারীত আলোচনা করা হয়েছে। আর বাংগালী জাতীয়তাবাদ মূলতঃ ব্রাহ্মন্যবাদেরই নতুন সংস্করণ, পৃথিবীতে ভাষা ভিত্তিক কোন জাতির সৃষ্টি হয় না। সর্বকালে সর্বস্থানে ধর্মের উপরে ভিত্তি করে জাতির গোড়া পত্তন হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে জাতীয়তা, এখন সে ধর্ম, স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হোক আর মানুষের নিজস্ব আবিষ্কৃত হোক। জাতীয়তার সংজ্ঞা ধর্ম অনুসারীরা স্বাভাবিক কারণেই গ্রহণ করবে না। কারণ ধর্ম অনুসারীরা ধর্মের কাছে থেকেই গ্রহণ করবে তাদের জাতিত্বের পরিচয়। কোরানের ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামের অনুসারীরা মুসলিম জাতি– আর মুসলিম জাতির পিতা হলেন ইব্রাহীম (আঃ)। এখন ইসলামের অনুসারীরা শেখ মুজিবের আদর্শ গ্রহণ করবে না মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক আনিত আদর্শই গ্রহণ করবে। যেহেতু মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক আনীত ইসলামে ইসলামী জাতীয়তা তথা

www.pathagar.com

মুসলিম জাতীয়তা বোধের স্থান আছে সেহেতু ইসলামের অনুসারীরা মুসলিম জাতীয়তাবোধই অন্তরে লালন করবে। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামে মুসলিমদের সভ্যতা সংস্কৃতি কৃষ্টি, তাহযিব তমুদ্দুন ভিন্ন। মুসলমানদের বিয়ে লাশ সৎকারের ব্যবস্থা ইসলাম প্রদর্শিত পথে হয়। ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের বিয়ে মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা হয় সেই ধর্মের প্রদর্শিত পথে। এক একটি জাতির বিয়ে, লাশ সৎকারের পদ্ধতির সাথে অন্য জাতির অনুসরণীয় পদ্ধতির কোন মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন বাংগালী জাতির বিয়ে–সাদী দাফন–কাফন কোন পদ্ধতিতে হবে? আসলে ব্রাহ্মণরা তাদের আবিস্কৃত ধর্মের আবেদন হারিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাদের অনুচরদের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের নিজেদের উদরে প্রবেশ করানোর জন্যই বাংগালী জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যেমন করে তারা বুদ্ধিষ্টদের, শিখদের, জৈনদের নিজেদের মধ্যে বিলীন করার অপচেষ্টা করেছে এখন তারা মুসলিমদেরকেও ঐ একই কায়দায় ভক্ষণ করার জন্যে বাংগালী জাতীয়তাবাদের উদ্যত ফনা তুলে ধরেছে। হিন্দুরা যে তাদের ধর্মের আবেদন দিন দিন কোন্ কারণে হারিয়ে ফেলছে তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ) একদিন পানি পথে মিশর থেকে হিন্দুস্থানে আসতেছেন। হঠাৎ করে তিনি শুনলেন এই জাহাজেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আছেন। বাল্যকাল থেকেই উভয়ের মধ্যে চিনা–জানা ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন ভক্তবৃন্দ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় কবি বসে আছেন। শিবলী নোমানী (রহঃ) কে দেখে কবি তাড়াতাড়ি উঠে আলিংগন করে তাকে স্বসম্মানে পাশে বসালেন। কুশলাদী জিজ্ঞাসা করার পর আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ) কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা কবি, তোমাদের ধর্মের আবেদন এত স্থিমিত হয়ে আসছে কেন? মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর এই ধর্মের কোন গ্রহণ যোগ্যতা নেই। একথা শুনে কবি অনেক্ষণ নিরব থেকে এমন সুন্দর উত্তর দিলেন যা সর্বকালে সর্বযুগে ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কবি বললেন, নোমানী, যে কোন আদর্শ বা ধর্ম পৃথিবীতে বিস্তার করতে থাকে, দিন দিন পৃথিবীতে মানুষের কাছে এর গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ঐ ধর্মের বা আদর্শের মধ্যমনির কারণে।

যে মধ্যমনির, কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের চরিত্র হতে হবে নিষ্কলুষ, কালিমামুক্ত ও সব মানুষের জন্যে সর্বকালে সর্বদেশে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু আফসোস। আমাদের

www.pathagar.com

ধর্মের এমন একজন ব্যক্তিত্বও নেই যার আদর্শ সব মানুষের কাছে সব দেশে সর্বযুগে অনুসরণীয়। এদিক থেকে তোমরা মুসলিমরা ভাগ্যবান, তোমাদের ইসলামের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব এমনই এক অদ্বিতীয় চরিত্রের অধিকারী, তোমাদের মোহাম্মদ (দঃ) এমনি এক ব্যক্তিত্ব, যার ব্যক্তিত্ব চির অনুসরণীয়, যার ব্যক্তিত্বে কোন দাগ নেই।

সুতরাং কোন মুসলিম ঐ তথাতথিত বাংগালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতে পারে না এবং এই জাতীয় কোন সংগঠনে নিজেকে সম্পৃক্ত করতেও পারে না।

আর সমাজতন্ত্র যে কি তা আর ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ বিশ্বের স্মরণীয় ব্যক্তিরা সমাজতন্ত্রের অসারতা প্রমাণ করে এত বইপুস্তক লিখেছেন যে ঐ বইপুস্তকের নামগুলি একত্রিত করতে গেলে আলাদা একটি গ্রন্থই রচনা করতে হয়। বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব আঁদ্রে শাখারভ, আলেকজান্ডার সোল ঝোনিৎসিন প্রমুখ অমুসলিম চিন্তাবিদরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধিনস্ত মানুষগুলিকে ক্যানসার ওয়ার্ল্ড ও এ্যানিমেল ফার্মের সাথে তুলনা করেছেন। বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মওদূদী (রহঃ), শহিদ হাছানুল বান্না (রহঃ), শহিদ আঃ কাদের আওদাহ (রহঃ), শহিদ সাইয়েদ কুতুব (রহঃ), শহিদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী রহঃ), মরহুম আবদুর রহিম (রহঃ) সমাজতন্ত্র মানব সভ্যতা বিধ্বংসী একটি ঘৃনিত মতবাদ ও এই ব্যবস্থার অধীনস্ত মানুষগুলিকে "জেলখানার" অধিবাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আয়াতুল্লাহ খোমেনী (রহঃ) তো জীবিত থাকা অবস্থায় রাশিয়ায় দূত পাঠিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে সমাজতন্ত্র নামক ঘৃণিত আদর্শকে যাদুঘরে রাখার পরামর্শ দিয়ে গেছেন। আর বর্তমানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ রাশিয়ায় পেরেস্ত্রয়কাও গ্লাস্তনষ্ট নীতি দিয়ে সমাজতন্ত্রের পোষ্টমর্টেম করেছেন। সমাজতন্ত্রের কুৎসিত অবয়ব আজ বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ ও গণতন্ত্রকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় কত কোটি বনি আদমকে যে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে তার হিসাব বোধহয় খোদ সমাজতন্ত্রীদের কাছেও নেই। এক রাশিয়াতেই ষ্ট্যালিনের শাসনামলে দুই কোটি লোককে হত্য করা হয়েছে। এ খবর খোদ রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যম "তাস" জানিয়েছে যা আমাদের দেশের জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র পৃথিবীর যে দেশেই গিয়েছে সে দেশকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আফগানিস্থানের ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ

www.pathagar.com

মুসলিম সমাজতন্ত্র নামক বিষধর সর্পের দংশনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।

প্রতিবেশী বার্মাতে "সমাজতন্ত্র" মুসলিমদের কি অবস্থা করছে তা বাংলাদেশীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পর চরম বিরোধী আদর্শ। এদের মধ্যে সাপে– নেউলে সম্পর্ক। সমাজতন্ত্র যেখানে বাস করবে সেখানে গণতন্ত্রের "গ" ও থাকতে পারবে না, আর গণতন্ত্র যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে সমাজতন্ত্রের "স" ও থাকতে পারবে না। যার প্রমাণ খোদ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি।

সুতরাং আওয়ামী লীগ পরস্পর বিরোধী আদর্শ দিয়ে গোটা জাতিকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলতে চায়। আওয়ামী লীগ ও তাদের সমমনা দলগুলি জনগণের রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিশ্বাসঘাতকতা, আল্লাহর ইসলাম ও নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে এদেশবাসীর চিন্তা চেতনার জগৎ থেকে বিদায় করে দেওয়ার অপচেষ্টার ফলে আল্লাহর গযবে পড়ে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় নেয়।

আওয়ামী লীগের শাসন– দুঃস্বপ্নের কালো ইতিহাস

আওয়ামী লীগের শাসনামলের দুর্বিসহ দিনগুলির স্মৃতি প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে পড়লে এখানো তাদের শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। তথাকথিত স্বাধীনতা পন্থীদের অত্যাচারের নির্মম শাসন সম্পর্কে তেমন কিছু লিখবো না। শুধুমাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ব্যক্তিগত ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কাহিনী এদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরবো। আর সেই সাথে তাদেরকে অনুরোধ করবো যারা আবেগ উচ্ছ্বাস বিবর্জিত মানষিকতা নিয়ে পরিস্থিতির বিচার করেন, যারা অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে জেনে বুঝে অনুসরণ করেন, যারা ব্যক্তি পূজারী নয়, আদর্শের পূজারী, যারা পৃথিবীতে মানবতার কল্যাণ চান, যারা আধিপত্য বাদী সম্রাজ্যবাদীদের খপ্পড়ে পড়তে চান না, যারা দুনিয়ার সুখের তুলনায় আখেরাতের সুখকে প্রাধান্য দেন, যারা মুসলিম হিসাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চান, যারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় দেখতে চান, সব কিছু বিচারের মানদন্ড যাদের কোরান ও সুন্নাহ, সত্যানুসন্ধিৎসু মানষিকতা যাদের তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা এই বইটি পড়ার সাথে সাথে সাংবাদিকতার জগতে আন্তর্জাতিকভাবে একজন প্রশংসিত ব্যক্তি এ্যান্থানি ম্যাসকানহার্স কর্তৃক লিখিত "এলিগ্যাসী অব ব্লাড"

www.pathagar.com

বইটি অথবা বইটির বাংলা অনুবাদ "বাংলাদেশ– রক্তের ঋণ" মোহাম্মদ শাহজাহান কর্তৃক অনুদিত হক্কানী পাবলিসার্স কর্তৃক প্রকাশিত বইটি পড়ার জন্যে। আহমেদ মুসা কর্তৃক লিখিত "ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ" নামক বইটিও দেশ বরণ্য আলেম যিনি ইসলামী আন্দোলন এর কর্মীদের নিকট যুক্তিবাদী হিসাবে পরিচিত। ১৯৮৯ সনের শেষের দিকে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা বলতে গেলে একই ঘরে থেকে আমি যার কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেছি সেই সুসাহিত্যিক ইসলামী আন্দোলনের বয়োবৃদ্ধ নেতা মওলানা খন্দকার আবুল খায়ের (আল্লাহ তাকে ইসলামের খেদমত করার জন্যে আরও অধিক হায়াত দান করুন) কর্তৃক লিখিত "একত্তরে কি ঘটেছিল এবং রাজাকার কারা ছিল" বইটি এবং ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতিত নেতা এ, বি, এম খালেক মুজুমদার কর্তৃক লিখিত "শিকল পরা দিনগুলি" নামক দুই খন্ডে বিভক্ত বইটি পড়ুন। আল্লাহ আমাকে এই ত্যাগী নেতা খালেক মজুমদারের কিছুদিনের পবিত্র সঙ্গ পাবারও সুযোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখিত বইগুলি আপনারা সামান্য পয়সা খরচ করে পড়ুন তাহলে জানতে পারবেন ফ্যাসীবাদী আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও তাদের সমমনা দলগুলি যারা স্বাধীনতার সোল এজেন্সী নিয়ে বসে আছে তারা কত ভয়ংকর নির্মম নিষ্ঠুর। আরো পড়ুন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী মেজর (অবঃ) মরহুম জলিল (রহঃ) কর্তৃক লিখিত "অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা' নামক বইটি।

জামায়াত শিবির তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে হিংস্র খুনী, রগকাটা বাহিনী ধর্ষণকারী, ৭১–এর গণহত্যার নায়ক। স্বাধীনতা বিরোধী, মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বলে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা কেন দেশব্যাপী ঘোষণা করে তাদের নিয়ন্ত্রিত পত্র পত্রিকা সমূহ ইসলাম পন্থীদের বিপক্ষে প্রচার চালায় তার রহস্যও উল্লেখিত লেখকগণ তাদের লিখিত বইপুস্তকে ফাঁস করে দিয়েছেন এবং আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের ইতিবৃত্তঃ তুলে ধরেছেন। আরও বাস্তব ইতিহাস যদি জানতে চান তাহলে চলে যান মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদীন খাঁন সাহেবের নিকট যিনি এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক জেলজুলুম এমনকি ইলেকট্রিক চেয়ার–এ পর্যন্ত বসতে বাধ্য হয়েছেন। ইসলামের উপরে যার লিখা অনেকগুলি বই ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইসলামের জন্যে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু ও তার শেষ কপর্দকও দিতে প্রস্তুত। তার সাথেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে

www.pathagar.com

দীর্ঘ ছয়সাত মাসের মত একত্রে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার সাথে দেশব্যাপী জনসভা করতে গিয়েও চলতি পথে গুলি ও বোমা হামলার শিকার হয়েছি আমি নিজে। সালাম তিন জন সক্রীয় মুক্তিযোদ্ধার ভাই হয়েও তিনি ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে পেয়েছেন আল বদর রাজাকার উপাধি। অথচ তাদের এলাকার অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, এককালের নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় বর্তমানে চাকুরীজীবী ও ঈশ্বরদী ব্রাদার্স ইউনিয়নের কর্মকর্তা হাবিবর রহমানের (হবি ভাই) মুখেই শুনেছি ৭১–এ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধ করেছেন এবং সালামকে কাধেঁ নিয়ে পাক সেনাদের হিংস্রতা থেকে তাকে ও নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। ৭১–এ সালাম এত ছোট ছিল যে, কিসের জন্যে দেশে কি ঘটছে তিনি বুঝতেন না। তাদের গোটা পরিবার শহরের বাড়ী ছেড়ে গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল আর ঐ বাড়ীতে ছিল মুক্তি যোদ্ধাদের ক্যাম্প।

আওয়ামী লীগের অত্যাচারের ঘটনা যা সালামের নিজ চোখে দেখা তাহলো তাদের পাশের বাড়ীর মতিউর রহমান কচি ভায়ের নির্মম মৃত্যু। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, কচি ভাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার প্লাটুন কমান্ডার। সবে মাত্র যৌবনে যখন তিনি পদার্পন করেছিলেন, তখন দেশকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে হাতে কিছুদিন পূর্বেও শোভা পেত জ্ঞান অর্জনের সামগ্রী খাতা কলম বই।

১৯৭২ সনের ১১ই নভেম্বর। সালামের আপন সহদোর মরহুম আবদুস সাত্তার তিনিও মুজিব সেনাদের হাতে নিহত হন। "ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামীলীগ" নামক গ্রন্থের ২৯০ পৃষ্ঠায় নিহতদের তালিকায় ১৭নং নামটি সালামের বড় ভাইয়ের। তার বড় ভাই এ তারিখে চতুর্থ সন্তানের জনক হলেন। সন্তানটি কন্যা সন্তান। বর্তমানে ছাত্রী। নাম রীমা। কচি ভাই সংবাদ পেয়ে ১১ তারিখে সকাল নয়টায় দৌড়ে এলেন বড় ভাইয়ের মেয়েকে দেখার জন্য। প্রতিবেশী হিসাবে সালাম ও তাদের বাড়ীতে উভয় পরিবারের সকলেরই যাতায়াত ছিল। সালামকে তখন হাফেজী পড়ানো হচ্ছে। তিনি তখনও খুবই ছোট। বাড়ীর বারান্দায় বসে তিনি কোরান মুখস্ত করছিলেন। বারান্দায় তাকে দেখে বলে উঠলেন কচি ভাই, বড় ভাবী কোন রুমে? আমি মেয়ে দেখব। বড় ভাবী, বড় ভাবী বলে ডাকতে লাগলেন কচি ভাই। সালাম আঙ্গুলের ইশারায় বড়

www.pathagar.com

ভাবীর আঁতুর ঘরটি দেখিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে তার বড় মা এসে কচি ভাইকে নিয়ে গেলেন তার নাতনীকে দেখাতে। মেয়ে খুবই সুন্দরী হবে ইত্যাদি মন্তব্য করে মিষ্টি খেতে চেয়ে কচি ভাই ঈশ্বরদী বাজারে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কসমেটিকের দোকান খোলার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। তখন যদি তিনি জানতেন যে, কচি ভাইয়ের এই যাওয়াটা শেষ যাওয়া, তিনি আর কোন দিন বড় ভাবীর কাছে মিষ্টি খেতে চাইবেন না, তাহলে বড় ভাবীকে তিনি বলতেন রাত্রে নয়, এখনই আমার শ্রদ্ধেয় কচি ভাইকে মিষ্টি খাইয়ে দাও। তার বড় ভাবী বলেছিলেন, কচি তুমি রাত্রে এসে মিষ্টি খেয়ে যেও।

মনে হয় আধা ঘন্টাও হয়নি, সালাম কোরান পড়া অবস্থায়ই শুনতে পেলেন কচি ভাইয়ের গর্ভধারিনী মায়ের গগন বিদারী আর্ত চিৎকার। যেয়ে তিনি শুনলেন এমন একটি মর্মান্তিক সংবাদ যা তাদের পরিবারসহ এলাকার সকল এর বুকে শেলের মতই বিদ্ধ হলো। কচি ভাই নেই, তাকে শেখ মুজিবের হিংস্র হায়েনা মুজিববাদীরা তার দোকানের মধ্যেই গুলি করে মেরেছে। কচি ভাইয়ের পাশে বসাবস্থায় সালামের আরও একজন আপন ভাই আবদুস সামাদ মজনু কোন ক্রমে রক্ষা পেয়েছেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। অনেকের সাথে বাজারে গিয়ে যে দৃশ্য সালাম দেখলেন, তা ছিল যেমন করুণ তেমনি হৃদয়বিদারক। দোকানের মেঝেতে পড়ে আছে কচি ভাইয়ের নিথর নিস্তব্ধ স্পন্দনহীন দেহ। চতুরদিকে লাল রক্তের বন্যায় যেন ভেসে আছে কচি ভাই। তখনও কচি ভাইয়ের মুখ থেকে আকর্ষণীয় হাসির শেষ রেশটুকু বিদায় নেয়নি, দেখে যেন মনে হচ্ছে রক্তিম আভাযুক্ত রক্তজবায় সজ্জিত বাসর শয্যায় শায়িত কচি ভাই। নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে আছেন তিনি কচি ভাইয়ের মুখের দিকে আর তার স্মৃতি সাগরে উর্মিমালার সৃষ্টি করছে কচি ভাইয়ের বিগত জীবনের অনেক স্মৃতি। কানে ভেসে আসছে তার নাম ধরে স্নেহের স্বরে ডাকটা। কত কথা মনে পড়তে লাগল সেই মুহূর্তে সালামের, আর তার নিজের অজান্তেই দুই চোখে নেমে এলো শ্রাবণের বারি ধারার ন্যায় উদগত অশ্রুর অদম্য স্রোত। অবিবাহিত কচি ভাইয়ের যুবকচ্ছটায় পরিপূর্ণ আকর্ষণীয় চেহারাটা তার চোখের সামনে অরুনধতি নক্ষত্রের মতই উজ্জল, চির দীপ্তমান। আজও কচি ভাইয়ের বৃদ্ধা মাতা সন্তান হারানোর তীব্র যন্ত্রণায় আহাজারী করেন, কচি ভাইয়ের মায়ের বুকে এই অসহনীয় জ্বালা, বেদনার আগুনের অগ্নি শিখা আমৃত্যু অনির্বান।

কিন্তু কচি ভাইয়ের হত্যার হয় নাই কোন বিচার। আজও তিনি জানতে

www.pathagar.com

পারেননি কোন অপরাধের কারণে কচি ভাই মুজিব সেনাদের ষ্টেনগানের খোরাকে পরিণত হয়েছেন। কচি ভাইয়ের খুনীদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরদী আওয়ামী লীগ শাখা নেতৃত্ব এর পদ অলংকৃত করে আছে। মহাদাপটে আজও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সালামের বড় ভাই মরহুম আবদুস সাত্তার তিনি এতই গোবেচারা ধরনের মানুষ ছিলেন যে, তার বুদ্ধি হবার পর থেকে বড় ভাই কারো সাথে জোরে কথা বলেছেন এমন কথা তার কানে আসেনি। মুজিববাদী হিংস্র হানাদার দল রাতের অন্ধকারে এসে তাদের বাড়ী ঘেরাও করলো। তার ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা রাত্রি চারটার ঘন্টা দিতেই অভ্যাস মত তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অজু করে কোরান নিয়ে বসতে হবে, বিছানা ছেড়ে বার্থ রুমের দিকে যাবার চিন্তা তিনি করছেন এমন সময় তার ঘরের দরোজায় লাথির শব্দ ও বাড়ীর চতুর্দিকে অনেক লোকের উপস্থিতি এবং সেই সাথে নানা মন্তব্য সালামের কানে আসতে লাগলো। কেও বলছে পেট্রোল ঢেলে অগুন ধরিয়ে দে, কেউ বলছে গ্রেনেড মেরে বাড়ী উড়িয়ে দেই। ওদিকে সমানে ঘরের দরোজায় লাথি চলছে। তিনি বার বার বলছেন আপনারা কে, কি চান? লিখার অযোগ্য কিছু শব্দ ব্যবহার করে সালামকে বলা হলো, দরোজা খুলতে, তিনি ইতিপূর্বে এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি। অপর দিকে তার রুমের পাশের রুম থেকে তার বড় ভাই ও ভাবী এসে তার রুমের ভিতর দিকের দরোজার কড়া নেড়ে জানতে চাচ্ছেন কি হয়েছে। সালামদের পরিবারটা অনেকটা বড় বলে তার মরহুম পিতা বেশ কয়েকটি বাড়ী করেন। তার মধ্যে এই বাড়ীটাই সবচেয়ে বড়। ঘটানার সময় তাদের নয় ভাইয়ের মধ্যে মাত্র তিন ভাই ছিলেন বিবাহিত। তাই সবাই মিলে তারা এক বাড়ীতেই বাস করতেন। ওদিকে বাড়ীর সদর দরোজাতেও তীব্র আঘাত চলছে। দরোজা খুলে দেওয়ার জন্য। এই হই হুল্লোড়ে বাড়ীর ঘুমন্ত শিশু তো জেগেছেই এমনকি গৃহপালিত পশুগুলি পর্যন্ত ভয় বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তিনি ভয়বিহ্বল হয়ে রুমের দরোজা খুলে দিতেই তার বড় ভাই এসে বাইরের দরজা খুলে দিলেন। ওদিকে তার আব্বাও সদর দরজা খুলে দিয়েছেন। এর পর বাড়ীর মধ্যে যারা প্রবেশ করলো তারা সবাই তাদের পরিচিত। এদের সবাই নানা ধরনের মারণাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ঐদিনের রুদ্রমূর্তি তিনি কোন দিনই ভুলতে পারবেন না। ওরা সবাই নিষিদ্ধ পানীয় পান করে এসেছিল। ঐ হিংস্র পশুর দল তাদের বাড়ীর প্রতিটি রুমে প্রবেশে করে স্বর্ণ অলংকার নগদ অর্থ মুল্যবান ইলেকট্রোনিকস্ সামগ্রী লুট করতে লাগলো। আর তারা সবাই নিরবে দর্শকের

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। ওদের আচরনে তাদের পরিবারের ছোট শিশুটি পর্যন্ত ক্ষনিকের জন্য হলেও কাঁদতে ভুলে গিয়ে ছিল। যাবার সময় ওরা সালামের প্রাণ প্রিয় পিতৃতুল্য বড় ভাইকে ওদের সাথে যেতে আদেশ করলো, তখন তার আব্বা ও দুই আম্মার সাথে বলতে গেলে রীতিমত ধস্তাধস্তি আরম্ভ হলো মুজিব সেনাদের সাথে বড় ভাইকে কেন্দ্র করে। আর তার বড় ভাবি বড় ভায়ের রাত্রিকালীন পোশাকের পিছন অংশ খামছে ধরে খুনীদের সাথে তীব্র বাদানুবাদ করে যাচ্ছেণ। তারা নিরস্ত্র ওরা স্বসস্ত্র, অবশেষে খুনীরা জয়ী হলো।সালামের বড় ভাইকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার বড় ভাই শুষ্ক কণ্ঠে কোন মতে বললেন মা, এক গ্লাস পানি দিন, ওরা বললো পানি একবারেই খেয়ো, এখন চলো। তার বড় ভাইকে নিয়ে গেল খুনীরা, বড় ভাবী আর্তচিৎকার দিয়ে অচেতন হয়ে গেলেন, দুই মা; আব্বাসহ পরিবারের সবাই পাথরের মূর্তির মত যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে রইলো। গোটা বাড়ীটায় যেন কবর স্থানের নিরবতা নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরা আতংক গ্রস্ত। কেউ এসে তাদেরকে শান্তনা দিবে, ইচ্ছে থাকা সত্বেও আসার সাহস পাচ্ছে না। এমনি এক বিভীষিকাময় মুহূর্তে সালামের বড় ভাইয়ের বড় ছেলে জাহাঙ্গীর (বর্তমানে সউদীতে চাকুরী রত) তার দাদা দাদীকে ধরে বলতে লাগলো, ও দাদা, দাদী আমার আব্বুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল? আমার আব্বুকে কেন নিয়ে গেল? তোমরা যাও আমার আব্বুকে এনে দাও। জাহাঙ্গীরের করুণ আর্তনাদে সালামের আব্বা ও দুই আম্মা জ্ঞান ফিরে পেলেন। (উল্লেখ্য সালামের আব্বার স্ত্রী দুই জন) তার দুই আম্মা আব্বাকে বললেন, তুমি এম পি সাহেবের কাছে যাও, সে তো তোমার বন্ধু মানুষ। ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। সালামের আব্বা তার আম্মাদ্বয়কে বললেন, ওরা এতই নিষ্ঠুর যে, বন্ধুত্বের মূল্য তারা দিবে না। পারলে তোমরা দুই জন যাও প্রয়োজনে পায়ে ধরবে আওয়ামী নেতৃত্ববৃন্দের, ছেলেকে বাচাঁনোর জন্যে। আমি বড় বোমাকে সুস্থ করি। আব্বা না যাওয়ার কারণ এখন সালাম বুঝে, কারণ তার আব্বা সে সময় এমন অনেক দৃশ্য দেখতেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের যে, তিনি জানতেন নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া এ সময় করার আর কিছুই নেই। সালামের দুই আম্মা চলে গেলেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে। মা হিসাবে ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যে, ভূমিকা পালন করা দরকার তারা সে ভূমিকা পালন করলেন। তার আম্মাদ্বয়কে আওযামী লীগের নেতৃবৃন্দের দেওয়া শেষ উত্তর ছিল। "এত ঘাবড়ানোর কি আছে। নয় ছেলের মধ্যে সবে মাত্র একটা গেল, এখনওতো আটটা আছে।"

www.pathagar.com

পরবর্তীতে তার বড় ভাইয়ের লাশ এলো বাড়ীতে পরের দিন বেলা ১১ টার দিকে। লাশের দিকে তাকানো ছিল অসম্ভব। লাশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন ক্ষুধিত ব্যঘ্র তার ক্ষুধা নিবারণ না করে আহারের প্রতি তীব্র প্রতিহিংসায় শিকারের দেহ ধারালো নখর দিয়ে ছিন্নভিন্ন করেছে।

সালামের ভাবী হারালেন তার প্রাণাধিক স্বামীকে, সন্তানগুলি চিরতরে পিতার স্নেহ বঞ্চিত হলো, বড় ছেলেকে হারিয়ে সালামের আব্বা ছেলে হারানোর ব্যথায় ধুকে ধুকে অন্তিম শয্যায় শায়িত হলেন, সালাম হারালো আদর্শ পরিবার গঠনের দক্ষ শাসককে আর মাদ্বয় হারালেন প্রাণ প্রিয় পুত্র ধনকে। তাদের পরিবারের নেমে এলো সীমাহীন শূন্যতা। গোটা পরিবারটি চলে গেলো চরম অনিশ্চয়তার দিকে, অবস্থা এমন হলো যেন একটি সাজানো ফুলের বাগান ঈশান কোণ থেকে উঠে আসা কালবৈশাখীর ভয়াল ছোবল, নিষ্ঠুর তান্ডবলীলায় তছনছ হয়ে গেল। বছরের পর বছরে চলে যাচ্ছে, মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে রাত্রির পরে দিন আসছে, আসছে না শুধু সালামের বড় ভাই। শুনতে হচ্ছে শুধু তার মায়ের বুকফাটা আহাজারী। মায়ের চোখ যেন হয়ে গেছে ক্রন্দসী আকাশ, অবিরত ধারায় অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে, কবির ভাষায়, "স্নেহের নিধি হারিয়ে, সদা অশ্রু সজল ছলো ছলো আখি"

এ ধরনের বিষাদময় ঘটনা বাংলাদেশে তথাকথিত স্বাধীনতাপন্থী বন্য হায়েনা হিংস্র মুজিব সেনারা সংঘটিত করেছে যা একত্রিত করলে বিষাদসিন্ধুকে হার মানাবে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাবলী নিয়ে মীর মোশাররফ হোসেন রচনা করেছেন "বিষাদ সিন্ধু" জানিনা তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ এর নব্য এজিদ মুজিবের লাল বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাবলী নিয়ে তিনি কি রচনা করতেন।

এই আওয়ামী লীগরা স্বাধীনতার নাম ভাংগিয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যযজ্ঞ বাংলার বুকে অনুষ্ঠিত করেছে তা হিটলার মুসেলীনির মত নরঘাতককেও লজ্জা দিয়েছে। অতীতকালে পৃথিবীর যে কোন দেশের গণহত্যার ইতিহাসকে আওয়ামী লীগ ম্লান করে দিয়েছে। ভারতীয়দের নীল নকশা মাফিক তারা এ জাতিকে ইসলামী চিন্তাচেতনাহীন জাতিতে পরিণত করার জন্যে ইসলামী চিন্তাবিদদেরই হত্যা করেছে বেশী পরিমাণে। দাঁড়ি টুপিওয়ালা মানুষ পেলেই তারা ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। রছুলের বংশধর মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানীকেও এরাই হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগ ও তাদের সাংগপাংগ তথা ইসলামের শত্রুদেরকে এদেশের মুসলিমদের পক্ষ থেকে আমি স্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সেদিন

www.pathagar.com

কারবালার ময়দানে, ফোরাতের প্রান্তরে ইমাম হোছেন (রাঃ) কে এজিদীয় সৈন্যরা পেয়েছিল একা। আজ ইমাম হোছেন কিন্তু একা নয়, ইমাম হোছেনের অগনিত অনুসারী রয়েছে এদেশে। সুতরাং একজন আলেমের গায়ে হাত পড়লে গোটা বাংলায় আগুন জ্বলে উঠবে।

আওযামী দুঃশাসনের কিছু ইতিহাস পত্র–পত্রিকা থেকে তুলে ধরছি। আরও তুলে ধরছি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) মরহুম জলিলের কিছু কথা, তাহলে পাঠক মহল বুঝতে পারবেন ৭১–এর ঘাতক ও স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামী না আওয়ামী লীগ। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে কারা তাও আশা করি বুঝতে পারবেন।

মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমান্ডার ইসলামের অগ্রসৈনিক মেজর (অবঃ) জয়নুল আবেদিন, কর্ণেল ফারুক, কর্ণেল রশিদ সহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা আর্মি অফিসারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, আপনারা কি মনে করেন, জামায়াতে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে? এবং ৩০ লক্ষ লোক নয় মাসের যুদ্ধে নিহত হয়েছে বলে শেখ মুজিব যে দাবী করেছেন তা বাস্তবতার আলোকে কতটুকু সত্য? তারা জবাবে বলেছেন, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে ভারতীয় চররাই। কেননা ৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নেয়াজী জাতিসংঘের মিঃ উথানটের কাছে আত্মসমর্পনের প্রস্তাব দেন তখনই রাজাকার আলবদর বাহিনীর লোকেরা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অস্ত্র ফেলে দিয়ে যে দিকে পেরেছে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক ১৪ই ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবী হত্যার কোন প্রশ্নই উঠে না। শুধু তাই নয় ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীনতা লাভের পরে জহির রায়হানকে মারলো কারা? ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্বাধীনতা পন্থীরাই ক্ষমতায় আছে, তারা কেন বুদ্ধিজীবী হত্যার কোন তদন্ত করেন না? তাহলে বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে স্বাধীনতা পন্থীদের কালো হাত সক্রীয় ছিল? তদন্ত করলে কি থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়বে?

আর শেখ মুজিবের ৩০ লক্ষ লোক মরেছে এ দাবীর সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। আসলে ইসলাম পন্থীদেরকে অনাগত নাগরিকদের কাছে নির্মম নিষ্ঠুর হিসাবে তুলে ধরার জন্যেই ইসলাম বিরোধী কুচক্রী মহলের হোতা হিসাবে শেখ মুজিব এই দাবী করেছে। এই মিথ্যকথা বলাও জাতির সাথে গাদ্দারী করার কারণে শেখ মুজিবের মরণোত্তর বিচার হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

৩০ লক্ষ মানুষ নয় মাসে যে মরেনি এবং শেখ মুজিবের দাবীকে অকাট্য দলিল দিয়ে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মওলানা খন্দকার আবুল খায়ের সাহেব তার লিখিত "একাত্তরে কি ঘটেছিল এবং রাজাকার কারা ছিল" নামক বইতে। তারই বই থেকে হুবহু হিসাব উল্লেখ করলাম।

তিনি হিসাব করেছেন এইভাবে, "সরকারের বর্ষ পরিসংখ্যানের হিসাব মোতাবেক –ঐ সময় দেশে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬৮,৩৮৫টি। ইউনিয়ন ছিল ৪,৪৭২টি আর বাড়ীর সংখ্যা ছিল ১,২৬,৭৩,০০০টি। ১৯৭১–এ দেশের লোক সংখ্যা ছিল ৬,৯৭,৭৪,০০০ জন আর ১৯৭২ এ লোক সংখ্যা ছিল ৭,২৩,৯২,০০০ জন। আমরা যদি ৩০ লাখকে ৬৮ হাজার গ্রাম দিয়ে ভাগ দেই তাহলে মোটামুটি একটি হিসাব পেতে পারি যে, ৩০ লাখ লোক মরলে) প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে কতজন লোক মরা প্রয়োজন। এভাবে অংক কষলে দেখা যায় প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে ৪৫ জন করে লোক মরলে ৬৮ হাজার গ্রাম থেকে ৩০ লাখ লোক মরতে পারে। কিন্তু তাকি মরেছে? এক কোটি ২৭ লাখ বাড়ী থেকে ৩০ লাখ লোক মরলে প্রতি ৪টি বাড়ী থেকে মারা পড়বে গড়ে ১ জন করে এবং ৭ কোটি লোক থেকে ৩০ লাখ মরলে প্রতি ২৩ জনে ১ জন করে মরা লাগে। এখন আপনারা যারা ৭১–এর ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন তারা বলুনঃ

(১) গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে কি ৪৫ জন লোক মরেছে?

(২) প্রতি ৪টি বাড়ী থেকে কি গড়ে ১টি লোক মরেছে?

(৩) প্রতি ২৩ জনে কি গড়ে ১টি লোক মরেছে?

৯ মাসে ৩০ লাখ লোক মরলে প্রতি মাসে মরা লাগে

৩০ লাখ ভাগ ৯ = ৩,৩৩,৩৩৩ জন করে।

প্রতি দিন মরা লাগে ৩,৩৩,৩৩৩ ভাগ ৩০ = ১১,১১১ জন করে।

প্রতি ঘন্টায় মরা লাগে ১১,১১১ ভাগ ২৪ = ৪৩৬ জন করে।

প্রতি মিনিটে মরা লাগে ৪৩৬ ভাগ ৬০ = ৮ জন করে।

কিন্তু আপনারা যারা দেশে বাস করেছেন তারা বলুন ৯ মাসে প্রতি মিনিটে কি ৮ জন করে লোক মরেছে বলে আপনাদের মনে হয়?

সুপ্রিয় পাঠক, এবার আপনারাই বিচার করুন শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ কত বড় মিথ্যাবাদী। মিথ্যার ক্ষেত্রে গোয়েবলস ও ম্যাকিয়াভেলীকেও এরা লজ্জাদিয়েছে।

www.pathagar.com

একজন বিদেশী মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচির সাথে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার পড়ুন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে নতুন ঢাকা ডাইজেষ্টের নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যায়। ঢাকা ডাইজেষ্টটি আমার কাছে আছে। সাক্ষাৎকারের ঘটনা সত্য না হলে আওয়ামী পঞ্চম বাহিনী চ্যালেঞ্জ করুক। সাক্ষাৎকারে প্রকাশ হয়েছে ভুট্টো-শেখ মুজিবের ষড়যন্ত্রেই এদেশে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। ৭১-এর ঘাতক জামায়াতে ইসলামী নয়, খোদ শেখ মুজিব। আওয়ামী লীগ নেতা আঃ কাদের সিদ্দীকি ওরফে বাঘা সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বেয়নোট দিয়ে খুঁচিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মানুষকে হত্যা করেছে। ওরিয়ানা ফালাচির প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেছে আমার লোকদের কাছে গুলি ছিল না তাই বেয়নোট দিয়ে মেরেছে। অর্থাৎ মুজিবের ধারণা অনুযায়ী গুলি যখন থাকবে না তখন যা দিয়ে খুশী তাই দিয়ে প্রতিপক্ষকে মারা যেতে পারে। তাইতো আমরা ইতিহাসের আর এক অধ্যায়ে দেখি মুজিব সেনারা ১৯৮১ সনের মার্চ মাসের ১১ তারিখে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সবুজ চত্তরে কয়েক শত শিবির কর্মীকে শুধু ইট আর পাথর দিয়ে হত্যাযজ্ঞের পৈচাশিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। ইট ও পাথরের উপর শিবির কর্মীদের মাথা রেখে অপর পাথর খন্ড দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করছে এবং বলছে "তোদের মাথায় কি ইসলাম ঢুকেছে ইসলাম বের করে দেই"। আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে সেদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদার বক্স হলে আমার এক আত্মীয়ের কাছে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। অসহায় শিবির কর্মীদেরকে কত নৃশংস কায়দায় মুজিব সেনারা হত্যা করলো স্বচক্ষে দেখলাম। ওদের পাথরের আঘাতে শিবির কর্মীদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল শুধু কালেমায় তৈয়য়েবা। আমার পরনে ওদের দৃষ্টিতে ইসলামী পোষাক থাকার কারণে আমার উপরেও হামলা এসেছিল। পরিচিত কিছু ছাত্রদের হস্তক্ষেপে আমি কোন মতে নিহত হওয়া থেকে আহত হয়ে ঐ দুঃসহ স্মৃতিবুকে নিয়ে আজও ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের আশায় চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেদিন দেখেছিলাম, বড় বড় ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষকরা কিভাবে শিবির কর্মীদের হত্যায় তারা সহযোগিতা করেছিল। যেমন সহযোগিতা তারা করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী আন্দোলনের নেতা নিজামী ভাইকে হত্যার প্রচেষ্টার ব্যাপারে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের তদানিন্তন সেক্রেটারী জেনারেল (পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সভাপতি) সাইফুল ইসলাম খাঁন মিলন ভাই পাগলের মত ছুটে একবার ভিসির

www.pathagar.com

কাছে যাচ্ছেন আর একবার পুলিশ সুপারের কাছে যাচ্ছেন। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে প্রবেশ করে ঐ হিংস্র হয়েনাদের হাত থেকে ইসলামের সৈনিকদের রক্ষা করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে ভি,সি সাহেবের অনুমতি পাবার আশায় অপেক্ষা করছিল, কিন্তু নাস্তিক ভিসি অনুমতি দেয়নি। ফলে ইসলামী আন্দোলনের অনেকগুলি ফুল ভোরের আলোয় না ফুটতেই পৃথিবী থেকে ঝরে গেল।

নাটোর জেলার তাছনিম আলম ভাই (যিনি পরবর্তীতে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হয়েছিলেন) যিনি আমাকে আমার কিশোর বয়স থেকেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাকে দেখেছি ঘটনার দিন একাকী অবস্থায় হাতে শুধু মাত্র গড়ান কাঠের লাঠি নিয়ে ইসলামের শত শত শত্রুদের তাড়া করে শিবির কর্মীদের ওদের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে। তার মধ্যে সেদিন লক্ষ্য করেছি শাহাদাতের অদম্য কামনা। চতুর্দিক থেকে অবিরত আঘাত আসছে আর তিনি যথা সম্ভব আঘাত প্রতিহত করে শিবির কর্মীদের হেফাজত করছেন। আমি আহত অবস্থায় শিবির নেতা আঃ রহমান ভায়ের সাথে রাজশাহী মেডিকেলে যোহর নামাজের পর গিয়ে শিবির কর্মীদের যে করুণ অবস্থা দর্শন করলাম, সে স্মৃতি আজও আমার নয়ন যুগোল অশ্রু সজল করে তোলে।

ইট পাথর, লাঠি, ছোরা, কিরিচ, রামদা, হকিষ্টিকের আঘাতে শিবির কর্মীদের থেতলানো ক্ষতবিক্ষত দেহ, শাহাদাত প্রাপ্তরা কালো পর্দায় আবৃত, নার্স ও ডাক্তারদের ছোটাছুটি, আহত ভাইদেরকে রক্ত দেওয়ার জন্যে সুস্থ শিবির কর্মীদের রক্তদানের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি দেখে আমি আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে এসে আল্লাহর কাছে শুধু এই বলে কেঁদেছি, "প্রিয় বন্ধু পৃথিবীতে বাড়ী, গাড়ী, সুন্দরী স্ত্রী কোন কিছুই তোমার কাছে চাই না মাবুদ, শুধু চাই, আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে তোমার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই চোখে যেন দেখে যেতে পারি রছুলে আওলাদ মাহমুদ মোস্তফা আলমাদানী সহ যে সমস্ত দ্বীনের কর্মীরা যে উদ্দেশ্যে রক্ত দিয়েছে সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আর না হয় মৃত্যু শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস নেবার পূর্বে এই কানে যেন আসে যে, বাংলার জমিনে তোমার দ্বীন কায়েম হচ্ছে।

দুঃখজনক হলেও চরম সত্য যে, ঘটনার পরের দিন এদেশের জাতীয় পত্র পত্রিকায় যে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশিত হলো মজলুম শিবির কর্মীদের বিরুদ্ধে তা দেখে আমার মনে পড়ে গেল আল্লাহর নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর কথা। "যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের হাতে রক্তাক্ত হয়ে বলছেন, যে জাতি সত্যের বাহকদের

www.pathagar.com

মেরে রক্তাক্ত করে দেয় আফসোস সেই জাতির জন্যে।" আমি তখনই মনে মনে আশংকা প্রকাশ করলাম, এই জাতির কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। আমার আশংকা আজও এ জাতির ইতিহাসের গতিধারায় সত্য। এরা এখনো এদের কাংখিত শান্তি পায়নি। ক্ষমতার পালাবদল এরা ঠিকই করছে কিন্তু ইসলামের সৈনিকদের এরা এখানো ক্ষমতায় পাঠায়নি।

ওরিয়ানা ফালাচির দিনলিপি ও শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাতকার

রোববার সন্ধ্যাঃ আমি কোলকাতা হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করেছি। সত্যি বলতে কি, ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তি বাহিনী তাদের বেয়োনেট দিয়ে যে হত্যা যজ্ঞ চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার পর পৃথিবীতে আমার অন্তিম ইচ্ছা এটাই ছিল যে, এই ঘৃন্য নগরীতে আমি আর পা ফেলবো না– এরকম সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার সম্পাদকের ইচ্ছা যে, আমি মুজিবের সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। ভুট্টো তাকে মুক্তি দেবার পর আমার সম্পাদকের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল। লোকজন মুজিবের কথা বলাবলি করছিল। তিনি কি ধরনের মানুষ? আমার সহকর্মীরা স্বীকৃতি দিলো, তিনি মহান ব্যক্তি, সুপারম্যান। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশকে সমস্যা মুক্ত করে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করতে পারেন। আমার স্মরণ হলো, ১৮ই ডিসেম্বর আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন লোকজন বলছিল, "মুজিব থাকলে সেই নির্মম, ভয়ংকর ঘটনা কখনোই ঘটতো না। মুজিব প্রত্যাবর্তন করলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।" কিন্তু গতকাল মুক্তিবাহিনী কেন আরো ৫০ জন নিরীহ বিহারীকে হত্যা করেছে? "টাইম" ম্যাগাজিন কেন বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিযে হেডলাইন করেছে "মহান ব্যক্তি না বিশৃংখলার নায়ক?" আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সনের নভেম্বরে সাংবাদিক অগলডো শান্তিনিকে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, "আমার দেশে আমি সবচেয়ে সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ, আমি বাংলার বাঘ, দিকপাল.....এখানে যুক্তির কোন স্থান নেই.....।" আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমার কি ভাবা উচিত।

সোমবার বিকেলঃ আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এবং আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দ্বিগুণের অধিক। ঘটনাটা হলো, আমি মুজিবকে দেখেছি। যদিও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। সাক্ষাতকার নেওয়ার পূর্বে তাকে এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এই কয়েকটা মুহূর্তই আমার চিত্তকে দ্বিধা ও সংশয়ে পূর্ণ করতে

www.pathagar.com

যথেষ্ট ছিল। যখন ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করি, কার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল? তিনি আর কেউ নন, মিঃ সরকার। আমার শেষবার ঢাকা অবস্থানকালে এই বাংগালী ভদ্রলোক আমার দোভাষী ছিলেন। তাঁকে দেখলাম রানওয়ের মাঝখানে। আমি ভাবিনি, কেন? সম্ভবতঃ এর চেয়ে ভালো কিছু তার করার ছিল না। আমাকে দেখামাত্র জানতে চাইলেন যে, আমার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন কিনা? তাকে জানালাম যে, তিনি আমাকে মুজিবের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেন কিনা? তিনি সোজা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পনের মিনিটের মধ্যে আমরা একটা গেট দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম মুজিবের স্ত্রী খাচ্ছেন। সাথে খাচ্ছে তার ভাগনে ও মামাত ভাই-বোনেরা। একটা গামলায় ভাত-তরকারী মাখিয়ে আংগুল দিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে সবাই। এদেশে খাওয়ার পদ্ধতি এরকমই। মুজিবের স্ত্রী আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমার কাঁধে তার হস্ত স্থাপন করায় আমার জ্যাকেটে কড়াভাবে তার তৈলাক্ত আংগুলের ছাপ পড়ে গেল, যা ড্রাই ক্লিনিং করেও উঠানো যাবে না। এরপর তিনি সমানে কথা বলতে শুরু করলেন। যার একটা শব্দও আমার বোধগম্য হয়নি, ঠিক তখনই মুজিব এলেন। সহসা রান্না ঘরের মুখে তার আবির্ভাব হলো। তার পরনে চোগারমত এক ধরনের সাদা পোষাক, যাতে আমার কাছে তাকে মনে হয়েছিল একজন প্রাচীন রোমান হিসেবে। চোগার কারণে তাকে দীর্ঘ ও ঋজু মনে হচ্ছিল। তার বয়স একান্ন হলেও তিনি সুপুরুষ। ককেশীয় ধরনের সুন্দর চেহারা। চশমা ও গোঁফে সে চেহারা হয়েছে আরও বুদ্ধিদীপ্ত। যে কারো মনে হবে, তিনি বিপুল জনতাকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সুস্বাস্থের অধিকারী। কিন্তু আট মাসের বন্দী জীবন এবং যে ভোগান্তির কথা তিনি দাবী করেন তা চেহারা দেখে অল্পই আঁচ করা যায়। পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই তাকে ভালোভাবে খেতে দিয়েছে।

আমি সোজা তার কাছে গিয়ে পরিচয় পেশ করলাম, এবং আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। মিঃ সরকার ভূমিতে পতিত হয়ে মুজিবের পদচুম্বন করলেন এবঙ ধীরে ধীরে পা, নিতম্ব উদর বেয়ে কাঁধ পর্যন্ত উঠে তা আঁকড়ে থাকলেন। আমার প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। আমি বোবার মত দাঁড়িয়ে আছি। অতঃপর সরকার তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়ের আংগুলের ডগা চুম্বন করলেন। আংগুলগুলি স্যান্ডেলের সম্মুখ ভাগ দিয়ে বের হয়েছিল। আমি বাধা দিলাম। কারণ আমার ধারণা হয়েছিল মিঃ সরকার এই প্রক্রিয়াটা অব্যাহত

www.pathagar.com

রাখলে কোন অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন। আমি মুজিবের হাতটা আমার হাতে নিয়ে বললাম, "এই নগরীতে আপনি ফিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত, যে নগরী আশংকা করছিল যে আপনি আর কোন দিনই এখানে ফিরবেন না। "তিনি আমার দিকে তাকালেন একটু উষ্মার সাথে। একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে তিনি বললেন, "আমার সেক্রেটারীর সাথে কথা বল। এর পর মিঃ সরকারের শরীরটা ডিংগিয়ে খাওয়ার টেবিলে চলে গেলেন। মিঃ সরকার তখন যেন ফ্লোরের সাথে মিশে আছেন। আমার দ্বিধা ও সন্দেহের কারণ উপলব্ধি করা সহজ। মুজিবকে আমি জেনে এসেছি একজন গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী হিসাবে। যখন আমি দম নিচ্ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে এসে বললো, সে ভাইস সেক্রেটারী। বিনয়ের সাথে সে প্রতিশ্রুতি দিল, বিকেল চারটার সময় আমি "হোয়াইট হাউজে" হাজির থাকতে পারলে আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হবে। মুজিবের সরকারী বাসভবনের নাম "হোয়াইট হাউজ" তার সাথে যারা সাক্ষাত করতে চায় তাদের সাথে তিনি সেখানেই কথা বলেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় নগরী ক্লান্ত, নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত- মধ্যাহ্নের বিশ্রাম নিচ্ছে। কাঁধে রাইফেল ঝুলানো মুক্তিবাহিনী টহল দিচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে এক মাসেরও বেশী আগে। কিন্তু এখনো তাদের হাতে অস্ত্র আছে। তারা রাত দিন টহল দেয়। এলোপাথাড়ি বাতাসে গুলি ছোড়ে এবং মানুষ হত্যা করে। হত্যা না করলে দোকানপাট লুট করে। কেউ তাদের থামাতে পারে না- এমনকি মুজিবও না। সম্ভবতঃ তিনি তাদের থামাতে সক্ষম নন। অথবা এই কর্মকান্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানোর কোন ইচ্ছা তার নেই। তিনি সন্তুষ্ট এ জন্যে যে, নগরীর প্রাচীর তার পোষ্টার সাইজের ছবিতে একাকার। অদ্ভুত, মুজিবকে আমি আগে যেভাবে জেনে ছিলাম, তার সাথে আমার দেখা মুজিবকে মিলাতে পারছি না। ইনি কি কেসিয়াস ক্লে

সোমবার সন্ধ্যাঃ না তিনি কেসিয়াস ক্লে হতে পারেন না। যদিও তার সাথে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তাকে মুসোলীনির মত মনে হয়। একই মনোভাব এবং অভিন্ন তার প্রকাশ, একইভাবে মনে হবে যেন শক্ত চেয়াল ভেদ করে চিবুকটা বেরিয়ে আসছে, এমনকি কন্ঠস্বরও একই রকম। দু'জনের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, মুসোলিনী যে একজন ফ্যাসিষ্ট তা তিনি স্বীকার করেছেন কিন্তু মুজিব তা লুকিয়ে রেখেছেন- মুক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্যের মুখোশের অন্তরালে। আমি যে তার সাক্ষাতকার নিয়েছি- এটা ছিল একটা দুর্বিপাক। তার মানষিক যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। তিনি কি উন্মাদ? এমনকি হতে

www.pathagar.com

পারে যে, কারাগার এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভীতি তার মস্তিষ্ককে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে?

তার ভারসাম্য হীনতাকে আমি আর কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি না, একই সময়ে আমি বলতে চাচ্ছি কারাগার এবং মৃত্যুর ভয় ইত্যাদি– সম্পর্কে কাহিনীগুলো আমার কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়, এটা কি করে হতে পারে যে, তাকে যে রাতে গ্রেফতার করা হলো, যে রাতে সকল পর্যায়ের লোককে হত্যা করা হলো? কি করে সম্ভব যে, এতো কান্ডের মধ্যে তার এবং তার পরিবারের কারো কেশাগ্র বা মাথা স্পর্শ করা হলো না? কি করে এটা হতে পারে যে তাকে কারাগারে একটি প্রকোষ্ট থেকে পলায়ন করতে দেওয়া হলো, যেটি তার সমাধি সৌধ হতো? তিনি কি গোপনে ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? তার কাছে কিছু একটা রয়েছে যা সত্য নয়। আমি যত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, তত মনে হয়েছে, তিনি কিছু একটি লুকোচ্ছেন। আমি এমন কি তার মধ্যে যে সার্বক্ষণিক আক্রমণাত্মক ভাব, সেটাকে আমার মনে হয়েছে আত্মরক্ষার। ঠিক চারটায় আমি হোয়াইট হাউজে ছিলাম। ভাইস সেক্রেটারী আমাকে করিডোরে বসতে বললেন, যেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোকের সমাগম ছিল, তিনি অফিসে প্রবেশ করে মুজিবকে আমার উপস্থিতি জানালেন। আমি একটা ভয়ংকর গর্জন শুনলাম এবং নিরীহ লোকটি কম্পিতভাবে পুনরায় আবির্ভূত হয়ে আমাকে প্রতিক্ষা করতে বললেন। আমি প্রতিক্ষা করলাম এক ঘন্টা, দুইঘন্টা, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা রাত আটটা যখন বাজলো, তখনো আমি সেই অপরিসর করিডোরে অপেক্ষমান, রাত সাড়ে আটটায় অলৌকিক ঘটনা ঘটলো– মুজিব আমাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, আমাকে প্রবেশ করতে বলা হলো, আমি বিশাল এক কক্ষে প্রবেশ করলাম, একটি সোফা ও দুটি চেয়ার সে কক্ষে, মুজিব সোফার পুরোটায় নিজেকে বিস্তার করেছেন, এবং দু'জন মোটা মন্ত্রী চেয়ার দুটো দখল করে বসে আছেন বিপুল বপু বাতাসে ছড়িয়ে। কেউ দাঁড়ালো না, কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানালো না, কেউ আমার উপস্থিতি গ্রাহ্য করলো না, মুজিব আমাকে বসতে বলার সৌজন্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত সুদীর্ঘক্ষণ নিরবতা বিরাজ করছিল। আমি সোফার ক্ষুদ্র প্রান্তে বসে টেপ রেকর্ডার খুলে প্রথম প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি, কিন্তু আমার সে সময়ও ছিল না, মুজিব চিৎকার শুরু করলেন, 'হ্যারি আপ, কুইক, আন্ডারষ্ট্যান্ড? নষ্ট করার মত সময় আমার নেই, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

www.pathagar.com

পাকিস্তানীরা ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করেছে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ইয়েস থ্রি থ্রি থ্রি (তিনি কি করে এই সংখ্যাটি স্থির করলেন, আমি কখনো তা বুঝবো না, ভারতীয়রা নিহতের যে সংখ্যা দিয়েছে তা কখনো দশ লক্ষের কোটা অতিক্রম করেনি) আমি বললাম "মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার--" মুজিব আবার চিৎকার করলেন "ওরা আমার নারীদেরকে তাদের স্বামী ও সন্তানদের সামনে হত্যা করেছে। স্বামীদের হত্যা করেছে তাদের ছেলে ও স্ত্রীর সামনে, মা বাপের সামনে ছেলেকে, দাদা দাদীর সামনে নাতিনকে, নাতির সামনে দাদা দাদীকে, ভাই বোনের সামনে ভাই বোনকে, চাচার সামনে চাচীকে, শালার সামনে শালীকে, "মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, আমি বলতে চাই ----।

তোমার কোন কিছু চাওয়ার অধিকার নেই, ইজ দ্যাট রাইট? আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো তাকে নরকে প্রেরণ ও প্রস্থান। কিন্তু একটা বিষয় সম্পর্কে আমি আরও কিছু জানতে চাই। বিষয়টা আমি বুঝতে পারছিলাম না।

মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, গ্রেফতারের সময় কি আপনার উপরে নির্যাতন করা হয়েছিল? নো ম্যাডাম নো, তারা জানতো, ওতে কিছু হবে না, তারা আমার বৈশিষ্ট, আমার শক্তি, আমার সম্মান, আমার মূল্য, বীরত্ব সম্পর্কে জানতো, আন্ডার ষ্ট্যান্ড? তা বুঝলাম, কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে তারা আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলাবে? ফাঁসীতে ঝুলিয়ে কি মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়? "নো নো ডেথ সেন্টেনস,"

এই পর্যায়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্থ মনে হলো এবং তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন, "আমি এটা জানতাম, কারণ ১৫ই ডিসেম্বর ওরা আমাকে কবর দেওয়ার জন্য একটা গর্ত খনন করে,"

"কোথায় খনন করা হয়েছিল সেটা?"

"আমার সেলের ভিতরে।"

"আমাকে কি বুঝে নিতে হবে যে গর্তটা ছিল আপনার সেলের ভিতরে?"

"ইউ মিস আন্ডার ষ্ট্যান্ড।"

আপনার প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার?"

"আমাকে একটা নির্জন প্রকোষ্টে রাখা হয়েছিল। এমন কি আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেয়া হতো না, সংবাদপত্র পাঠ করতে বা চিঠি পত্রও দেয়া হতো না, আন্ডার ষ্ট্যান্ড?"

www.pathagar.com

তাহলে আপনি কি করেছেন?

আমি অনেক চিন্তা করেছি, বহু পড়াশুনা করেছি।

আপনি কি পড়েছেন?

বই এবং অন্যান্য জিনিস।

তাহলে আপনি কিছু পড়েছেন?

হ্যাঁ, কিছু পড়েছি।

কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল, আপনাকে কোন কিছুই পড়তে দেয়া হযনি।

ইউ মিস আন্ডার ষ্ট্যান্ড।

তা বটে মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার। কিন্তু এটা কি করে হলো যে, শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলালো না।"

"জেলার আমাকে সেল থেকে পালাতে সহায়তা করেছেন এবং তার বাড়ীতে আশ্রয়দিয়েছেন।

কেন তিনি কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন?

আমি জানিনা, তার সাথে আমি কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার সাথে কিছু বলেন নি,

নিরবতা সত্ত্বেও কি আপনারা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে সাহায্য করতে চান।

তা হলে আপনি তার সাথে কথা বলেছেন?

হ্যাঁ, আমি তার সাথে কথা বলেছি।

আমি ভেবেছিলাম, আপনি কারো সাথেই কথা বলেন নি।

ইউ মিস আন্ডার ষ্ট্যান্ড।

তাহলে মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার। যে লোকটি আপনার জীবন রক্ষা করলো আপনি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন না?

এটা ছিল ভাগ্য, আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি।

এরপর তিনি ভুট্টো সম্পর্কে কথা বললেন। এ সময় তার কথায় কোন স্ববিরোধীতা ছিল না। বেশ সতর্কতার সাথেই বললেন তার সম্পর্কে। আমাকে মুজিব জানালেন যে, ২৬ শে ডিসেম্বর ভুট্টো তাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তাকে রাওয়ালপিন্ডিতে নেওয়া। তার ভাষায় ভুট্টো একজন ভদ্রলোকের মতই

www.pathagar.com

ব্যবহার করলেন। তিনি সত্যিই ভদ্রলোক। ভুট্টো তাকে বলেছিলেন যে, একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য মুজিব ব্লাক আউট ও যুদ্ধ বিমানের গর্জন থেকে বরাবরই যুদ্ধ সম্পর্কে আঁচ করেছেন। ভুট্টো তার কাছে আরও ব্যাখ্যা করলেন যে, এখন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং তার কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করতে চান।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কি প্রস্তাব মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার? তিনি উত্তর দিলেন, হোয়াই শুড আই টেল ইউ? এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রাইভেট আফেয়ার। আমার কাছে বলার প্রয়োজন নেই মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, আপনি বলবেন ইতিহাসের কাছে। মুজিব বললেন আমিই ইতিহাস। আমি ভুট্টোকে থামিয়ে বললাম, যদি আমাকে মুক্তি দেয়া না হয়, তাহলে আমি আলাপ করব না, ভুট্টো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উত্তর দিলেন, আপনি মুক্ত, যদিও আপনাকে শীঘ্র ছেড়ে দিচ্ছিনা, আমাকে আরো দুই বা তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে। এর পর ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তার পরিকল্পনা তৈরী করতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি অহংকারের সাথেই জানালাম, দেশবাসীর সাথে আলোচনা না করে আমি কোন পরিকল্পনা করতে পারি না, এই পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে তো কেউ বলতেই পারে যে, আপনাদের আলোচনা খুবই বন্ধুত্বপূর্নপরিবেশেহয়েছিল।

তা তো বটেই। আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানি,। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। কিন্তু তা হয়েছিল আমার জানার আগে যে, পাকিস্তানীরা আমার জনগণের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত নিপীড়ন করেছে। আমি জানতাম না যে, তারা সন্তানের সামনে মাকে, পুত্রের সামনে পিতাকে, পিতার সামনে পুত্রকে দাদার সামনে নাতিকে হত্যা করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি তাকে থামিয়ে বললাম, আমি জানি মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, আমি জানি, তিনি গর্জে উঠলেন, তুমি কিছুই জানো না, চাচার সামনে চাচীকে শালার সামনে ভাইকে হত্যা করেছে। আমি তখন জানতাম না যে, তারা আমার স্থপতি, আইনবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক আমার চাকরকে হত্যা করেছে এবং আবার বাড়ী, জমি, সম্পত্তি ধ্বংস করেছে, আমার--

তিনি যখন তার সম্পত্তির অংশে পৌছলেন, তার মধ্যে এমন একটা ভাব দেখা গেল, যা থেকে এই প্রশ্নটা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম যে, তিনি সত্যই সমাজতন্ত্রী কি না? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ---। তার কণ্ঠে দ্বিধা।

www.pathagar.com

তাকে আবার বললাম যে, সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বুঝেন? তিনি উত্তর দিলেন। "সমাজতন্ত্র" তাতে আমার মনে হলো, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা নেই, এর পরই অবতারণা হলো নাটকের।

১৮ই ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। নীচের অংশটুকু আমার টেপ থেকে নেয়াঃ

ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?

ঢাকা ষ্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি।

ঢাকা ষ্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছো। মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, আমি মিথ্যেবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি চাইলে আমি আপনাকে তার ছবিও দেখাবো। আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

মিথ্যেবাদী, ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।

মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, দয়া করে "মিথ্যাবাদী" শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তি বাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আব্দুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনিফর্ম পরাছিল। "তাহলে ওরা হয়তো রাজাকার ছিল, যারা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল এবং কাদের সিদ্দিকী তাদের নির্মুল করতে বাধ্য হয়েছে।"।

মিঃ প্রাইম মিনিষ্টার, কেউ প্রমাণ করেনি যে, লোকগুলি রাজাকার ছিল এবং কেউই প্রতিরোধের বিরোধিতা করেনি। তারা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়া চড়াও করতে পারছিল না।

"মিথ্যে বাদী"

"শেষবারের মত বলছি, আমাকে 'মিথ্যে বাদী' বলার অনুমতি আপনাকে দিবো না।" আচ্ছা সে অবস্থায় তুমি কি করতে?

আমি নিশ্চিত হতাম যে, তারা রাজাকার ও অপরাধী। ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতাম এবং এভাবে এই ঘৃন্য হত্যাকান্ড এড়াতাম। "ওরা সেভাবে করেনি। হয়তো আমার লোকদের কাছে বুলেট ছিলনা"

"হ্যাঁ, তাদের কাছে বুলেট ছিল। প্রচুর বুলেট ছিল। এখনো তাদের কাছে প্রচুর বুলেট রয়েছে। তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গুলি ছোড়ে। ওরা গাছে, মেঘে, আকাশে, মানুষের প্রতি গুলি ছোড়ে শুধু আনন্দ করার জন্যে।"

এরপর কি ঘটলোঃ যে দুই মোটা মন্ত্রী নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন গোটা

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারের সময়টায়, সহসা তারা জেগে উঠলেন। আমি বুঝতে পারলাম না, মুজিব কি বলে চিৎকার করছেন। কারণ কথাগুলি ছিল বাংলায়, খুনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আমি চুপচাপ কেটে পড়লাম।

সোমবার রাতঃ গোটা ঢাকা নগরী জেনে গেছে যে, মুজিব ও আমার মধ্যে কি ঘটেছে। শমশের ওয়াদুদ নামে একজন লোক ছাড়া আমার পক্ষে আর কেউ নেই। লোকটি মুজিবের বড় বোনের ছেলে। এই যুবক নিউইয়র্ক থেকে এসেছে তার মামার কাছে। তার মতে একটা বাসন মোছার ন্যাকড়ার মত ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে। সে আরো বললো যে, মুজিব ক্ষমতালোভী এবং নিজের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা সম্পন্ন অহংকারী ব্যক্তি। তার মামা খুব মেধা সম্পন্ন নয়। বাইস বছর বয়সে মুজিব হাই স্কুলের লেখাপড়া শেষ করেছেন। আওয়ামী লীগ সভাপতির সচিব হিসাবে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এ ছাড়া আর কিছু করেননি তিনি। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে মুজিব একদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওয়াদুদের মতে আত্মীয়স্বজনদের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণ এটা নয়। আসলে একমাত্র ওয়াদুদের মাকেই মুজিব ভয় করতেন। এই দুঃখজনক আচরণের জন্য তিনি পারিবারিকভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। সে আরো জানালো যে আমার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা সে তার মাকে জানাবেন। যাতে এব্যাপারে মুজিবের সাথে কথা বলেন। সে আমাকে আরো বললো যে, সরকারী দফতরে গিয়ে এ ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ করা উচিত। এবং প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলা উচিত, কারণ প্রেসিডেন্ট খাঁটি ভদ্রলোক।

মুজিব সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাবলী তার জন্যে বিপর্যয়কর। ১৯৭১ এর মার্চে পাকিস্তানের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকান্ডের কিছু দিন পূর্বে ইয়াহিয়া খাঁন ও ভুট্টো ঢাকায় এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খাঁন যথা শীঘ্র ফিরে যান। কিন্তু ভুট্টো ঢাকায় রয়ে যান। তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাখা হয় তার এ্যাপার্টমেন্ট ছিল ৯১১-৯১৩। কেউ কি ধারণা করতে পারে কে- তার গাইড ছিল? লোকটি শেখ মুজিবর রহমান। এখন তাকে বলা হয "মুজিব"। দু'জন বরাবর একত্রে ছিলেন। অবিচ্ছেদ্য, ঠিক দু'জন প্রেমিক প্রেমিকার মত। হোটেল অ্যাপার্টমেন্টে তারা হুইস্কি ও স্ন্যাকসের অর্ডার দিতেন এবং সব সময় হাসতেন। একদিন তারা নৌকা যোগে পিকনিকেও গেছেন। তারা যদি শত্রুই হবেন তাহলে এসব হয় কি করে? এর পর ২৫শে মার্চ রাত ১০টায় মুজিব নিখোঁজ হয়ে গেলেন এবং ট্রাজেডির শুরু হলো।

www.pathagar.com

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সর্বোচ্চ তলায় তখন ভুট্টোর ভূমিকা ছিল নিরোর মত। নগরী যখন জ্বলছিল এবং এলোপাথারি গুলিবর্ষণ চলছিল, ভুট্টো তখন মদপান করছিলেন আর হাসছিলেন। পরদিন সকাল সাতটায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। কিন্তু যাবার আগে একটি টেলিফোনে মুজিবের নাম উল্লেখ করেন। তিনি কি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন, যাতে তার বন্ধুর কোন অমংগল না ঘটে? এ সত্যটা ঢাকায় সব সময়ই সুস্পষ্ট ছিল। আমি দেখেছি যারা এক সময় পাকিস্তানীদের ভয়ে ভীত ছিল, তারা এখন মুজিবকেই ভয় করে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচুর কথাবার্তা চলে এদেশে। কিন্তু সব সময়ই তা বলা হয় ফিসফিসিয়ে, ভয়ের সংগে লোকজন বলাবলি করে যে, এই সংঘাতে মুজিব খুব সামান্যই হারিয়েছেন। তিনি ধনী ব্যক্তি অত্যন্ত ধনবান, তার প্রত্যাবর্তনের পরদিন তিনি সাংবাদিকদেরকে হেলিকপ্টার দিয়েছিলেন। কেউকি জানে কেন? যাতে তারা নিজেরা গিয়ে মুজিবের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অবলোকন করে আসতে পারে। এখনো তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। আসলে তিনি ভান করেন। তিনি কি তার জমিজমা, বাড়ী, বিলাসবহুল ভিলা, মার্সিডিজ গাড়ী জাতীয়করণ করবেন? মুখোশ উন্মোচন করে মুজিব স্বীকার করুক, কে তার বন্ধু–বৃটিশ এবং আমেরিকানরা। যখন তিনি কোন বৃটিশ বা আমেরিকানের সাথে সাক্ষাত করেন তখন তিনি এটা স্বীকার করেন। তা–নাহলে কারাগার থেকে মুক্তির পর সরাসরি দিল্লী না গিয়ে লন্ডন গেলেন কেন? "করাচী ও তেহরানের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না" এটা সত্য নয়। তিনি এথেন্স বা তেহরান যেতে পারতেন এবং সেখান থেকে ভারতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সংগে ৫২ মিনিটের পরিবর্তে ২৪ ঘন্টা কাটাতে পারতেন।

ভুট্টোর সাথে মুজিবের প্রথম সাক্ষাত হয় ১৯৬৫ সালে, যখন তিনি ভারতের সংগে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তকে অরক্ষিত রাখার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন। একজন নেতা হিসাবে তার মূল্য ছিল খুবই কম। তার একমাত্র মেধা ছিল মূর্খ লোকদের উত্তেজিত করে তোলার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন কথামালা ও মিথ্যার যাদুকর– চরম মিথ্যা। কিছুদিন আগে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলন "করাচির রাস্তাগুলো সোনা দিয়ে মোড়া। তা দিয়ে হাঁটলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। "অর্থনীতির কিছুই বুঝতেন না তিনি। কৃষি ছিল তার কাছে রহস্যের মতো। রাজনীতি ছিল প্রস্তুতিহীন। কেউ কি জানে ১৯৭০ এর নির্বাচন এ তিনি কেন বিজয়ী হয়েছিলেন? কারণ সব মাওবাদীরা তাকে ভোট

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। সাইক্লোনে মাওবাদীদের অফিস বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং তাদের নেতা ভাসানী আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনগণকে যদি পুনরায় ভোট দিতে বলা হয়, তাহলে মুজিবের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে। যদি তিনি বন্দুকের সাহায্যে তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে না চান, সে জন্যেই তিনি মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছেন না এবং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্তপিপাসু কসাই, যে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিল, সে আব্দুল কাদের সিদ্দিকী তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। ভারতীয়রা তাকে গ্রেফতার করেছিল, কিন্তু মুজিব তাকে মুক্ত করেন।

এখন আমরা গণতন্ত্রের কথায় আসতে পারি। একজন মানুষ কি গণতন্ত্রী হতে পারে, যদি সে বিরোধিতা সহ্য করতে না পারে? কেউ যদি তার সাথে একমত না হন, তাকে তিনি "রাজাকার" বলেন। বিরোধিতার ফল হতে পারে ভিন্নমত পোষণ–কারীকে কারাগারে প্রেরণ। তার চরিত্র একজন একনায়কের। অসহায় বাঙ্গালীরা উত্তপ্ত পাত্র থেকে গনগণে অগ্নিকুন্ডে পতিত হয়েছে। বাঙ্গালী রমনীদের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, তাদের সম্পর্কে কথা না বলাই উত্তম। তিনি নারীদের পাত্তাই দেন না।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে আবার মুজিবের সাথে দেখা করতে বললেন। সব ব্যবস্থা পাকা, প্রেসিডেন্ট যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তা খুব একটা সফল হয়নি। তিনি দু'জন কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তার নির্দেশ পালন করা হয়। মুজিবের কাছে একটা হুংকার ছাড়া তারা আর কিছুই পায়নি। তবে এবার করিডোরের বদলে একটা কক্ষে অপেক্ষা করার অনুমতি পেলাম। আমি বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। একজন বয় আমার চায়ের কাপ পূর্ণ করে দিচ্ছিল এবং এভাবে আমি আমার ১৮ কাপ চা নিঃশেষ করলাম। উনিশ কাপের সময় আমি চা ফ্লোরে ছুঁড়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম। আমাকে অনুসরণ করে হোটেলে এলো মুজিবের সেক্রেটারী ও ভাইস সেক্রেটারী। তারা বলল মুজিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় আমার সাথে দেখা করতে চান। ইতিমধ্যেই ঢাকায় শেখ মুজিবের উপনাম "শিট মুজিব" ছড়িয়ে পড়েছিল। নাম আমার দেয়া।

পরদিন সকালে ঠিক সাতটায় আমি হাজির হলাম এবং সকাল সাড়ে ন'টায় মার্সিডিজ যোগে মুজিবের আগমন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। একটা কথাও না বলে তিনি অফিসে প্রবেশ করলেন। আমিও অফিসে ঢুকলাম। আমার

www.pathagar.com

দিকে ফিরে তিনি উচ্চারণ করলেন "গেট আউট"। আমি কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত। তিনি বললন, "গেট ইন হিয়ার"। আমি ফিরলাম এবং তখনই তিনজন লোক পোষ্টার আকৃতির একটি ছবি নিয়ে এলো, দেখে তিনি বললেন "চমৎকার" এরপর তিনি বললেন, এই মহিলা সাংবাদিককে দেখাও। আমি "চমৎকার" শব্দটি উচ্চারণ করলাম। এ ছিল এক মারাত্মক ভুল। তিনি বজ্রের মত ফেটে পড়লেন। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ছবিটি ফ্লোরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা চমৎকার নয়"। আমি কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম।

আমি তার উত্তেজনা হ্রাসে সক্ষম হলাম, যেহেতু ভুট্টোর সাথে তার সত্যিকার সম্পর্কটা খুজে পেতে চাই, সেহেতু ভুট্টো সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।

নামটা বলা মাত্র তিনি জ্বলে উঠে বললেন যে, তিনি শুধু বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চান। আমি প্রশ্ন করলাম "বাংলাদেশের সাথে পশ্চিম বঙ্গকে যুক্ত করার সম্ভাবনা আছে কিনা? খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে তিনি বললেন, "এ সময়ে আমার কোন আগ্রহ নেই"। এই বক্তব্যে ইন্দিরা গান্ধীকেও বিস্মিত হতে হবে যে, মুজিব কোলকাতা করায়ত্ব করতে চায়। আমি বললাম, তার মানে আপনি বলতে চান, অতীতে আপনার আগ্রহ ছিল, এবং ভবিষ্যতে পুনঃ বিবেচনা করার সম্ভাবনা আছে? ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে আমি তাকে একটা ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছি। নিজের ভুল সংশোধন করার বদলে তিনি টেবিল মুষ্ঠাঘাত করে বলতে শুরু করলেন যে, আমি সাংবাদিক নই বরং সরকারী মন্ত্রী। আমি তাকে প্রশ্ন করছি না দোষারোপ করছি। আমাকে এখনই বের হয়ে যেতে হবে এবং পুনরায় আমি যেন এদেশে পা–না দেই।

এই পর্যায়ে আমি নিজের উপর সকল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম এবং আমার মাঝে উত্তেজনার যে স্তুপ গড়ে উঠেছিল তা বিস্ফোরিত হলো। আমি বললাম যে, তার পরিনতি হবে খুবই শোচনীয়। তখন তিনি মুখ ব্যদন করে দাঁড়ালেন আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম এবং রাস্তায় প্রথম রিকশাটায় চাপলাম। হোটেলে গিয়ে বিল পরিশোধ করলাম সুটকেসটা হাতে নিয়ে যখন বের হতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম মুক্তিবাহিনী নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা একথা বলতে বলতে আমার কাছে এলো যে, আমি দেশের পিতাকে অপমান করেছি এবং সেজন্যে আমাকে চরম মূল্য দিতে হবে। তাদের এই গোলযোগের মধ্যে পাঁচজন অষ্ট্রেলিয়ানের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হলাম। তারা এয়ার পোর্ট থেকে হোটেলে

www.pathagar.com

প্রবেশ করছিল। এয়ার পোর্টে দু'জন ভারতীয় কর্মকর্তা আমাকে বিমানে নিলেন এবং আমি নিরাপদ হলাম (২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২)।

অনুবাদঃ আনোয়ার হোসেন বাঙ্গাঁল।

এদেশের সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনা বিরোধী আদর্শের ধারক বাহক তথাকথিত স্বাধীনতা পন্থীরা ১৯৭১-এ এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভারতের হাতে তুলে দেয়। যার প্রমাণ ১৯৭১-এ ১৬ই ডিসেম্বরে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোঃ আতাউল গণি ওসমানীকে উপস্থিত হতে না দেওয়া। বাংলার দামাল ছেলেরা রক্তদিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনলো আর সেই বিজয় হয়ে গেল ছিনতাই। সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) মরহুম আব্দুল জলিলের ভাষায়, "আত্মসমর্পণের প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে ফিরে এসে বিনা প্রশ্নে গদিতে বসেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে কেন অনুপস্থিত ছিলেন সে সত্যটি উদঘাটন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের ঐ অসহায় মহানায়ক কর্ণেল ওসমানীর কতই না প্রশংসা। কেন এই মিছেমিছি প্রশংসা? এর অন্তরালে কি রহস্য? রহস্য তো নিশ্চয়ই আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধিনায়কের আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ১৬ই ডিসেম্বর, যাকে আমরা বিজয় দিবস হিসাবে অভিহিত করি, সেই দিন থেকেই বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধকে 'বিজয় দিবস' এর পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর "বিজয় দিবস" হিসাবে ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করা এবং পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের রনাঙ্গনে ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিজয় ঘোষণা করা।

এই বিজয়ে বাংলাদেশের মুক্তিপিপাসু জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নিরব দর্শক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছিল বিনয়ী তাঁবেদার এবং কর্নেল ওসমানী ছিলেন অসহায় বন্দী। এযেন ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিজয় এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই নব বিজিত ভারত ভূমির যোগ্য লীজ গ্রহণকারী সত্বা। সুতরাং যেমন সত্বা তেমনই তার শর্ত আর যায় কোথায়।

(মেজর (অবঃ) এম এ জলিল, অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা- পৃঃ ৩৬)

পৃথিবীতে কোন আদর্শের বাস্তবায়ন এবং যে কোন আন্দোলন সাফল্যের দ্বার

www.pathagar.com

প্রান্তে পৌছানো পর্যন্ত অনেক ত্যাগ ও তিতীক্ষার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে কোন ইমারত গড়তে গেলে বহু ইটকে চিরতরে মাটির নিচে চলে যেতে হয়, অনেক ইটকে সুরকী খোয়ায় পরিণত হতে হয়। এখন কোন ইট যদি রাজমিস্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলে, এই মিস্ত্রী, খবরদার আমার গায়ে হাতুরীর আঘাত করবে না এবং আমরা কেউ মাটির নীচে যাবো না, মাটির উপরে থেকে পৃথিবীর আলো বাতাস ভোগ করবো আর মানুষের উত্থান পতনের মজা দেখবো। ইটের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মিস্ত্রি যদি ইটকে মাটির নীচে না দেয় তাহলে ইমারত গড়া যায় না। ইতিহাসে আমরা দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে তখন পরিবর্তনকারী দলের মূল নেতা কর্মী অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে মাটির নীচে আশ্রয় নিয়েছেন চিরতরে বা নিজ দেহের রক্ত মাটিতে ঢেলে দিয়ে আদর্শের ইমারত গড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। নবী মোহাম্মদ (দঃ) শরীরে পবিত্র রক্ত দিয়েছেন ইসলাম বাস্তবায়ন করার জন্য। তিনিই ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতা। নিকট অতীতে ইরানে আমরা দেখলাম, ইমাম খোমেনী (রহঃ) এর ছেলে ইরানে ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে রেজা শাহের বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করলেন। খোমেনী ছিলেন ইরানে ইসলামী বিপ্লবের মূল নেতা।

অথচ বাংলাদেশে ৭১-এ যা ঘটলো, তাতে শেখ পরিবার অক্ষত থাকলো। ৭১-এর ঘটনা যে সাজানো নাটক নয়- এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? তাহলে আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা মুসলমানদের স্বাধীনতা কাফেরদের কাছে বন্ধক দেওয়ার জন্যেই কি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল ওসমানীকে উপস্থিত হতে দেয়নি? যুদ্ধ করলো যারা নিয়ম মাফিক তাদের নেতাদের কাছে তো পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ করার কথা। কিন্তু তা- না করে ইসলামের দৃষ্টিতে কাফের জেনারেল অরোরার নিকটে পাক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসমর্পণ করতে হলো কেন? স্বাধীনতাপন্থীরা এর কি জবাব দিবেন? ১৯৭১-এ জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের দাস সুলভ মনোভাব দেখে তারা পাকিস্তান রক্ষার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল- স্বাধীনতাপন্থীরা পারলে ইতিহাস দিয়ে প্রমাণ করুন? শুধু রাজাকার, আলবদর, স্বাধীনতা বিরোধী বলে চিৎকার করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করবেননা।

মেজর জলিল, যার অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আপনারা স্বাধীনতাপন্থীরা

www.pathagar.com

ক্ষমতায় থেকে এবং বিরোধী দলের নেতা সেজে সম্পদের পাহাড় গড়লেন, সেই ত্যাগী নেতার মৃত্যুর পর তার লাশটা এক নজর দেখতে যাওয়া দূরে থাক, পত্রিকায় একটি শোক বানীও আপনারা দেননি। আওয়ামী লীগরা জলিল সাহেবকে বড়ই অপছন্দ করে, কারণ ভারতের লুটপাটের ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠ। আওয়ামী বাকশালী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি চরম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, আর মেজর জলিল (রহঃ) এর বড় অপরাধ (?) ছিল আওয়ামী লীগ ও তার সমমনা দল গুলির কাছে যে, তিনি সমাজতন্ত্র নামক অজীর্ণ বস্তুকে বমি করে ফেলে দিয়ে ইসলাম কবুল করে বাংলার জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বাংলাদেশকে ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করার জন্য আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন দেশের সেনাবাহিনী পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোষাকের অনুরূপ পোষাকে সজ্জিত করে এক বাহিনী ময়দানে নামায়। যার নাম তারা দিয়েছিল "রক্ষী বাহিনী"। আর বাংলার নির্যাতিত মানুষ ঐ বাহিনীর নাম দিয়েছিল "রাক্ষশ বাহিনী"। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জলপাই রং এর পোষাক রক্ষীবাহিনীর গায়ে তুলে দেওয়ার অর্থ তো এটাই ছিল, যাতে গদি রক্ষার্থে প্রয়োজনের মুহূর্তে ভারতীয় বাহিনী এদেশে ঢুকে মুসলিম নিধন যজ্ঞ পালন করতে পারে এবং জনগ যেন ভারতীয় বাহিনীকে চিনতে না পারে এটাই ছিল আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য।

শেখ মুজিব বিভিন্ন ধরনের বাহিনী সৃষ্টি করে কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, কত বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, কয়লক্ষ যুবতীর ইজ্জত লুটেছে, কতটি ব্যাংক ডাকাতি করেছে, দেশের বিভিন্ন সম্পদ ট্রাকে করে ভারতে পাচার করেছে, কয়লক্ষ বনি আদমকে অনাহারে মেরেছে, তাদের ১৩৩৮ দিনের দুঃশাসনে মানুষ কিভাবে আর্তনাদ করেছে, এ প্রশ্নগুলির জবাব ঐ রব সাহেব, যাকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক বলা হয় তাকে জিজ্ঞেস করুন তিনি উত্তর দিবেন। কারণ তিনিও মুজিব সৃষ্ট বাহিনীর হাতে গুলি খেয়ে আহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে কি করবে জামায়াতে ইসলামী অনেক আগেই অনুমান করে ৭১-এ পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। কারা দেশ প্রেমিক? আওয়ামী লীগ না জামায়াতে ইসলামী? জামায়াতে ইসলামীই যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। শেখ মুজিব তার রুশ ভারত অক্ষ শক্তির মদদ পুষ্ট হয়ে এই জাতির স্কন্ধে যে নির্মম স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে

www.pathagar.com

দেয়, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তার অবসান ঘটানো ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। বাংলার অমিত তেজি, চির জাগ্রত ও মুক্তি পাগল মানুষ যখন একদিকে রুদ্র আক্রোশে ফুঁলছিল এবং অন্য দিকে এই শাসরুদ্ধকর অবস্থার হাত থেকে মুক্তির আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করছিল, ঠিক তখনই ইতিহাসের সেই মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়। সূচিত হয় ইতিহাসের নবতর অধ্যায়। কিন্তু তারপর, তারপরও গণ মানুষের অন্তরে রয়ে গেলে অনন্ত জিজ্ঞাসা। যে জিজ্ঞাসার জবাব ইতিহাসের কাছে স্বাধীনতা পন্থী বলে যারা দাবীদার তাদেরকেই দিতে হবে। মেজর জলিলের ভাষায়, "স্বাধীনতার ১৭ বছরে (মেজর জলিল যখন বইটি লিখেন তখন স্বাধীনতার বয়স ১৭ বছর ছিল) পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি-ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্যে ছুটে যেতে পারল? কোন সাহসে, কিংবা কোন আস্থার উপর ভর করেই বা তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমুড়ী খেয়ে পড়লো? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটিই কি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলাম পন্থী দলগুলোর শংকা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শংকা এবং অনুমান যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে দেশপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজকার- আলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মিমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উৎঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ভর করে। (মেজর (অবঃ) জলিল অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃষ্ঠা ৭-৮) সুতরাং এ কথা মেজর জলিলের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ৭১-এ জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতার বিরোধীতা করেনি, তারা করেছিল ভারতীয় সাম্প্রসারণ বাদের বিরোধীতা, আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় ভারতীয় বাহিনী এদেশে ঢুকে কিভাবে লুন্ঠন চালিয়েছে মেজর জলিলের ভাষায়, "দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ১৬ই ডিসেম্বর এর মিত্রবাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ মালামাল লুন্ঠন করতে দেখেছে। সে লুন্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুন্ঠন, সৈন্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের বহিঃ প্রকাশ স্বরূপ নয়। সে লুন্ঠনের চেহারা ছিল বীভৎস-বেপরোয়া সে লুন্ঠন

www.pathagar.com

ছিল একটি সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা।

পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যাক্ত কয়েক হাজার সামরিক বেসামরিক গাড়ী, অস্ত্র, গোলাবারুদ সহ আরো অনেক মূল্যবান জিনিষপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রাইভেট কার পর্যন্ত যখন রক্ষা পায়নি তখনই কেবল আমি খুলনা শহরের প্রাইভেট গাড়ীগুলি রিকুইজিশন করে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে হেফাজতে রাখার চেষ্টা করি।

এর পূর্বে যেখানে যে গাড়ী পেয়েছে সেটাই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সীমান্তের ওপারে।

যশোর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট করেছে। বাথরুমের মিরর এবং অন্যান্য ফিডিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি, রেহাই পায়নি নিরীহ পথ যাত্রীরা কথিত মিত্র বাহিনীর এই ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

(মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল (রহঃ) অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা পৃঃ ৩৭-৩৮)।

"অবস্থাদৃষ্টে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ভারতীয় সাহায্য প্রার্থনা, বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে খন্ড বিখন্ড করার সুবর্ন সুযোগ হিসাবেই - অপেক্ষামান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দারস্থ হয়।

আমি ভারতের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিগ্ধ ছিলাম। ভারত বৃহৎ দেশ, তাহার প্রয়োজনও বৃহৎ। ছোট ছোট দেশ বড় বড় দেশের স্বার্থে উচ্ছন্নে যাইতে বাধ্যহয়"।

"১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মাটি হইতে বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় পদার্পণ করে ২০ শে ডিসেম্বর। ইহা এক অভাবনিয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা। শুধু তাই নয়, স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের সরকার ১লা জানুয়ারী (১৯৭২) এক আদেশ বলে বাংলাদেশের মুদ্রামান শতকরা ৬৬ ভাগ হ্রাস করেন। উল্লেখ্য যে, এই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের মুদ্রামান ছিল ভারতীয় মুদ্রামান হইতে বেশী। তাজুদ্দিন সরকার এক ঘোষণায় দুই মুদ্রামানের বিমিনয় হারের সমতা আনিতে চাহিয়াছিলেন বটে কিন্তু ফল দাঁড়াইল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি এবং জনজীবনে আকাশচুম্বি দ্রব্য মূল্য।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় ও বাংলাদেশের অর্থনীতিদ্বয়কে পরস্পর সম্পূরক

www.pathagar.com

ঘোষণা করা হয় এবং এতদিন যাবত ভারতে পাট বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাজুদ্দিন সরকার ১৯৭২ এর ১লা জানুয়ারী হইতে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। তাজুদ্দিন সরকারের উক্ত ঘোষণা অর্থনীতির মূল সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না"।

ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র "অমৃত বাজার" এর ১২ই মে ১৯৭৪ সংখ্যার রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার দুই হইতে আড়াই শত রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে স্থানান্তরিত করিয়াছে। স্বর্ণের ভরি ১৭১ টাকা মানে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য যদি ৪৫০ কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে স্বর্ণভরি ১০০০ টাকা মানে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা হয়। তদুপরি মহাচীন কর্তৃক নির্মিত জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী হইতে অস্ত্র নির্মাণ যন্ত্রপাতি ভারতে স্থানান্তরের অভিযোগ উদিত হয়"।

(অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতির ১৯৪৫–৭৫পৃঃ, ৫২৮–৫৩১।)

সেই সৌখিন দেশপ্রেমিকরা যারা যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ভারতে গিয়েছিল তারা আজ সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। মানুষকে প্রতারণা করার ক্ষমতা ওদের অনেক। অভিনয় নিখুঁত। ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে ওরা কুণ্ঠাবোধ করে না। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, মহারথীরা আজো কোন এক অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য প্রভুদের অঙ্গুলী নির্দেশে চলতে বাধ্য। এই ঘটনাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির জীবনের বিপর্যয়ের মূলে অনেকাংশে আছে এই লোভী মানুষগুলোর অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি। জানিনা আর কত দিন করতে হবে।

"স্বাধীনতার পর কি হলো? এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলল বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার। উৎপাদন কমে গেল, বেড়ে গেল শ্রমিক অসন্তোষ। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গেল। বেড়ে গেল গুপ্ত হত্যা। কলকারখানা ধ্বংস হলো। কোন অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন বাংলার মানুষকে নিয়ে রক্তের হোলিখেলায় নেচে উঠল। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হলো অনেকে। সেই সব সৌখিন দেশপ্রেমিক সবাই মিলে ছারখার করেছিল বাংলার মানুষের স্বপ্নসাধ। চোরাকারবারের লাইন তারা আগেই করে রেখেছিল। পুরো দেশে ছেয়ে গেল অবৈধ ব্যবসা। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল জাদরেল সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী আর কিছু রাজনৈতিক কর্মী। শক্তিশালি মহলের সমর্থনপুষ্ট না হলে এত বিরাট

www.pathagar.com

আকারে অবৈধ ব্যবসা সম্ভব নয়। তাহলে কি একথা বলা যায় না, কোন প্রভাবশালী মহলের প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়েছে এদেশের অর্থনীতি? "শুধু তাই নয়, ভেজালে ছেয়ে গেল সমস্ত দেশ"।

"পুরো দেশটাই আজ যেন একটা পরিত্যক্ত সম্পত্তি। সবার লক্ষ্য হচ্ছে যেমন করেই হোক নিজের পকেট ভর্তি করা। সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাক তাতে কার কি এসে যায়? আর শাস্তির তো কোন ভয়ই নাই"।

"দীর্ঘ তিনটি বছর আমরা এই সব কলঙ্কময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের চোখের সামনে ধান চাল পাট পাচার হয়ে যায় সীমান্তের ওপারে। আর বাংলার অসহায় মানুষ খাদ্যের জন্য বিশ্বের দুয়ারে সাজে ভিখারী। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা শুধু ভৌগলিক হয়ে রইল। বিশ্ব মানব সভায় যে সম্মান আমরা পেয়েছিলাম, ভিক্ষার ঝুলি হাতে সে সম্মান স্বেচ্ছায় পদদলিত করেছি। স্বাধীনতা শুধু কিছু সংখ্যক ভাগ্যবানের জীবনে এনেছে অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য।

(মেজর (অবঃ), মোঃ রফিকুল ইসলামঃ দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী পৃঃ১১৯–১২৬)।

আওয়ামী বাকশালীরা যাই মনে করুক বাংলার মানুষ ঠিকই বুঝে নিয়েছিল যে, এটা ছিল সেই মারাত্মক খেলারই এক অনিবার্য পরিণতিঃ যে খেলায় গোটা মাঠে একদিকে ছিলেন শেখ মুজিব এবং অন্য দিকে ছিলেন কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার ধুরন্দর বরকন্দাজরা ভারতের দোসর হিসাবেই। বর্ডার চুক্তির নামে বেরুবাড়ী ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ফারাক্কা চুক্তির নামে ----বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার কারসাজী, টাকা বদলের নামে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে 'ফোকলা' করে ফেলা হয়েছিল। বর্ডার বাণিজ্যের নামে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল ভারতের বস্তাপচা মালামালের বাজারে। পাটের রাজা বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল পাটহীন। পক্ষান্তরে পাটহীন আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল গোটা পাঁচেক পাটকল। কলিকাতার পাটকলগুলি কয়েক শিফট্ চালিয়েও কাজ কুলাতে পারত না।

(আখতারুল আলমঃ দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী পৃঃ ১১৫–১১৬)

বহু ত্রুটির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি দশ মাইল এলাকাকে সীমান্ত আখ্যা দেওয়া। বাংলাদেশ ও ভারতের মোট চৌদ্দ'শ মাইল ব্যাপী সীমান্ত রেখার দশ মাইল এলাকাকে বর্ডার ট্রেডের জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়ার পরিণাম কি, যে

www.pathagar.com

কোন কান্ডজ্ঞানহীন লোকের চোখে তা ধরা পড়া উচিত ছিল। এর ফলে ভারত–বাংলাদেশের গোটা বর্ডার এলাকাই চোরা চালানের মুক্ত এলাকা হইয়া পড়ে।

সুখের বিষয় বছর না ঘুরিতেই এই চুক্তি বাতিল করা হইয়াছে। কিন্তু চুক্তি যে বিপুল আয়তনের চোরাচালান বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ করিয়া দিয়েছে তার কব্জা হইতে বাংলাদেশ আজও মুক্ত হইতে পারে নাই।

(আবুল মনসুর আহমদঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৪৯৮)

আতাউর রহমান খানঃ আমরা কেয়ামতের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। আইনের প্রতি ক্ষমতাসীনদের অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলেই দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা আইন–শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪)

ভাসানী ন্যাপঃ "যারা লুটপাট করে খেতে পারে না তাদের পক্ষে বাঁচার কোন উপায় নেই"। (৮ই এপ্রিল, ১৯৭৪)

আওয়ামী লীগের সহযোগী সিপিবিঃ "দেশ আজ চরম সংকট ও বিপর্যয়ের মুখে উপস্থিত। মজুতদার, মুনাফাখোর, কালোবাজারী, চোরাচালানী ও লাইসেন্স–পারমিট শিকারীদের চক্রান্তের সাথে দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাদের যোগসাজশ সর্বোপরি শাসকদের একাংশ উক্ত সমাজ–বিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছে বলেই বর্তমান সময়ে সংকট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে"। (১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৪)

৭০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি ঃ "বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট অতীতের সর্বাপেক্ষা জরুরী সংকটকেও দ্রুতগতিতে ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং ১৯৪৩ সনের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের পর্যায়ে পৌঁছাইয়া গিয়াছে।

বর্তমান পরিস্থিতিকে সরকার 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলিয়া অভিহিত করার মাধ্যমে দুর্দশার প্রতি চরম ঔদসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। মন্বন্তরের মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের উপর কোন প্রকার আস্থা স্থাপন না করিয়া সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছেন কতিপয় বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ও ঋণের উপর এবং অভ্যন্তরীণ এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, টাউট, বদমাতব্বর ও অনুশোচনাহীন আত্মসাৎকারীর উপর।

এ দুর্ভিক্ষ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠন ও পাচারের পরিণতি। ১৭৬১ সালের মন্বন্তর, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ন্যায় ১৯৭৪ সালের এই মন্বন্তরও মানুষ–সৃষ্ট এবং উৎপাদন–যন্ত্রের সহিত সম্পর্কবিহীন

www.pathagar.com

একশ্রেণীর মজুদদার, চোরাচালানী ও রাজনৈতিক সমর্থন পুষ্ট ব্যবসায়ীই ইহার জন্যদায়ী।

খাদ্য ঘাটতি কখনও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হইতে পারে না। সামান্যতম খাদ্যঘাটতির ক্ষেত্রেও শুধু বন্টন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যায়। যদি দেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নিম্নতম ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিচারকে নিশ্চিত করার সামান্যতম আন্তরিক চেষ্টাও থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধের তিন বছর পর এবং দুই হাজার কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক সাহায্যের পর '৭৪ সনের শেষার্ধে আজ, বাংলাদেশে অন্ততঃ অনাহারে মৃত্যুর পরিস্থিত সৃষ্টি হইত না। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও মন্বন্তরের মোকাবিলা কোন মানবিক প্রশ্ন নয়, ইহা একটি মৌলিক রাজনৈতিকপ্রশ্ন"।

তিন বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকার চাল পাচার হয়ঃ" গত তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য পাচার হয়েছে বলে একটি বিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। পশ্চিম বাংলার একটি মাসিক পত্রিকার ডিসেম্বর '৭৪ সংখ্যায় 'বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ! শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয় যে, 'বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষি দফতরের হিসাব অনুসারে ১৯৭১-এর পরবর্তী তিন বছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৩৩৩ লাখ টন। তাছাড়া ১৯৭৪-এ আউশ ধান উৎপন্ন হয়েছে ২৮ লাখ টন অর্থাৎ মোট উৎপাদন ৩৫১ লাখ টন। আর এই তিন বছরে খাবার জন্য মোট প্রয়োজন ৩২৩ লাখ টন এবং বীজ ধানের জন্য (মোট উৎপাদনের ১০%) প্রয়োজন ৩৩ লাখ টন অর্থাৎ মোট প্রয়োজন ৩৫৬ লাখ টন। এই তিন বছর (১৯৭৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত) বিদেশ থেকে মোট খাদ্য আমদানির পরিমাণ ৬৫ লাখ টন।

অর্থাৎ উৎপাদন ও আমদানি খাতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে, ৩৫১+৬৪= ৪১৫ লাখ টন, মোট প্রয়োজন যেখানে ৩৫৬ লাখ টন। অর্থাৎ প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হবার কথা- কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

(আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর রিপোর্ট, দৈনিক জনপদ।)

www.pathagar.com

৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার

দুইশ' বছরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা করতে পারেনি, ২৫ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যা করবার সাহস পায়নি, মাত্র তিন বছরে হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী বঙ্গবন্ধুরা (!) তা করেছে। বাংলাদেশের কি সর্বনাশ তারা করেছে তার একটি হিসাবের সার সংক্ষেপ দেখুনঃ

১। ধান, চাউল ও গমের পাচার হয়েছে ৭০/৮০ লাখ টন। মূল্য (গড়ে ১০০টাকা মূল্য ধরলে)	২১৬০ কোটি টাকা
২। পাট ৫০ লাখ বেলের উপরে	৪০০ কোটি টাকা
৩। ত্রাণসামগ্রী পাচার হয়েছে	১৫০০ কোটি টাকা
৪। যুদ্ধাস্ত্র, আমদানি করা যন্ত্রাংশ, ওষুধপত্র, মাছ, ছাগল, গরু, মহিষ, মুরগী, ডিম, বনজ সম্পদ ইত্যাদি মিলে	১০০০ কোটি টাকা
সর্বমোট–	৫০৬০ কোটি টাকা

"বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া সম্পদের বিনিময়ে প্রতিবেশী ভারত থেকে আমাদের দেশে আরো যে সব মহামূল্যবান সম্পদ আসতো তার একটি হচ্ছে ভারতে মুদ্রিত বাংলাদেশী জাল টাকা। এই জাল মুদ্রা পাচার এতোটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল যে, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মুদ্রা পাচারের ফলে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে। এক কথায়, যুদ্ধ–বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তখন হয়ে পড়েছিল দেশী–বিদেশী লুটেরাদের অবাধ লুণ্ঠন ক্ষেত্র। এখান থেকে খাদ্য শষ্য, অর্থকরী ফসল, বৈদেশিক মুদ্রা কেনা মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উধাও হয়ে গেছে আর তার বিনিময়ে এসেছে ভারতে ছাপা জাল কাগুজে টাকার নোট, বিড়ি পাতা আর গরম মসল্লা। এই চমৎকার ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়লেও ক্ষমতার স্নেহপুষ্ট এক শ্রেণীর তথাকথিত জননেতার পকেটে সাগরের জোয়ারের মত টাকা জমা হচ্ছিল এবং এত টাকা যে, সেটা তারা দেশের ব্যাংকে জমা রাখা নিরাপদ বোধ করতেন না।

(আবদুর রহিম আজাদ, একাত্তরের গণহত্যা–নায়ক কে? পৃঃ ৫২)

২৫শে মার্চ–এর গণহত্যা অভিযানের রাজনৈতিক শক্তি যখন জাতিকে অপ্রস্তুত অবস্থায় তোপের মুখে ঠেলে দিয়ে, জাতির সামনে কোন দিক–নির্দেশনা

www.pathagar.com

না দিয়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে সে সময় এই সেনাবাহিনীর সদস্যরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, জাতিকে পথ দেখিয়েছে। চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাক দিয়েছে সেনাবাহিনীরই একজন সদস্য–মেজর জিয়াউর রহমান। সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাস প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করেছে ইপিআর–এর সদস্যরা। ১১টি সেক্টরে সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন সশস্ত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সকল ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তখন মানুষকে সাহস যুগিয়েছে, নিরাপত্তা দিয়েছে, প্রতিরোধ যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছে এবং মানুষের শ্রদ্ধা–ভালবাসা কেড়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এভাবে জাতীয় স্বাধীনতার রক্ষা–কবচ হিসাবে জনচিত্তে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিব স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিলেন তাদের সরিয়ে দিলেন নেপথ্যে। তাদের অবস্থান, শক্তি এবং মর্যাদাকে আরো সংকুচিত করার জন্য গঠন করা হলো রক্ষী বাহিনী। অল্প দিনের মধ্যেই সাফল্যের সাথে রক্ষী বাহিনী নিজেকে সামাজিক ত্রাসরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধা হবে না। গোটা জাতি বুঝল, ৯ মাসে যে স্বাধীনতার জন্য তারা রক্ত ঝরিয়েছে সে স্বাধীনতা 'জলপাই' রং–এর হাতে বন্দী হয়ে গেছে।

এই জলপাই রংয়ের খেলায় সীমান্ত খুলে গেল। যার পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ পেল অত্যাশ্চার্য এক বিশ্ব পরিচিত– 'তলাহীন ঝুড়ি' (আব্দুর রহিম আজাদঃ প্রকারন্তরে গণহত্যার নায়ক কে? পৃঃ ৪৫)।

সেনাবাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগের তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা অবহেলাকে জেনারেল জিয়াউর রহমান তার এক ভাষণে স্বীকার করেছেন। ৭৫ সালে ১২ই নভেম্বর তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর ঐদিন পর্যন্ত (১৫ই আগষ্ট) যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের অবহেলা ছিল এতটাই যে, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল নিদারুণ হতাশা। (দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী।)

পত্র–পত্রিকার প্রতিক্রিয়াঃ "যশোর–খুলনা–কুষ্টিয়া এই তিনটি জেলার সমস্ত সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান নির্বিঘ্নে চলিতেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ প্রভাবশালী মহলের আশীর্বাদপুষ্ট এই সব সমাজ বিরোধী ব্যক্তি দমনে সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িয়াছে"। (দৈনিক ইত্তেফাক '৭২ সালের ১৭আগষ্ট।)

www.pathagar.com

লাইসেন্স পারমিটের জম-জমাট ব্যবসাঃ যাতাকলে পড়ে মানুষ খাবি খাচ্ছে (গণকণ্ঠ, ২৯ আগষ্ট, ১৯৭২।)

গরীব মানুষ খাদ্য পায় না, টাউটরা মজা লুটছে। (গণকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)

"বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জোয়ানগণ গত দুইদিন সীমান্ত এলাকা হইতে ভারতে ছাপা বিভিন্ন মানের মোট ২ হাজার ৭শ' ৬২ টাকার বাংলাদেশী কাগজী মুদ্রা আটক করিয়াছেন।" (ইত্তেফাক, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৩।)

এ যাবত ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ইসলামপুর, মৌলভীবাজার, চকবাজার হইতে ব্যবসায়ী নামধারী এক শ্রেণীর লোক হাজার হাজার মণ চাল, ডাল প্রভৃতি ক্রয় করিতে শুরু করিয়াছে। ব্যবসায়ী মহলও জিনিস-পত্র কেনার এই ধুম দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে ভাবিতেছেন যে, এই মালপত্র যাইতেছে কোথায়?. . . . .

"কোন একটি মহলের খবরে প্রকাশ, সীমান্তের ওপারে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সীমান্ত এলাকায় গুদাম নির্মাণ করিয়া এই সব জিনিসপত্র কিনিয়া গুদামজাত করিতেছে"। (ইত্তেফাক, ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৩)

"দুস্কৃতিকারী দমনের নামে চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমঃ পাবনায় যুবতী মেয়েরা ইজ্জতের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। (ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৩)

গেল হপ্তার রাজনীতিঃ রক্ষী বাহিনীর রদ্রু মুর্তির সামনে ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়েছিল। (জানুয়ারী ২৭, ১৯৭৪)

"খাদ্যোদ্বৃত্ত দিনাজপুর জেলাতেও দুর্ভিক্ষ উহার নিষ্ঠুর থাবা ফেলিয়াছে। ফলে দিনাজপুর জেলা সদরেই প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ জন অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। রেল ষ্টেশন ও ইহার আশেপাশে বুভুক্ষু মানুষের ভীড় ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় রংপুর হইতে হাজার হাজার অসহায় পরিবার দিনাজপুরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। – (ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৪)

দৈনিক ইত্তেফাকের আরেক দিনের রিপোর্ট ছিল, স্মাগলিং হয় সীমান্ত এলাকা হইতে, এ খবর সবারই জানা কিন্তু সরকারী খাদ্য গুদামেও যে এই কারবার হইয়া থাকে তাহার খোঁজ কেহ রাখেন কি? (ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর)

এক মুঠ নুন দ্যাও। –ইত্তেফাক, ১ আগষ্ট, ১৯৭৪

www.pathagar.com

দুঃখিনী বাংলাকে বাঁচাও। –ইত্তেফাক, ১০ আগষ্ট, ১৯৭৪

ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভাংগে।

–ইত্তেফাক, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

ওরা বুভুক্ষু মানুষের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে।– ঐ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষকের বিবৃতি ঃ দেশ মন্বন্তরের করালগ্রাসে।

–ইত্তেফাক, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

ক্ষুধার আগুন জ্বলিতেছে। –ইত্তেফাক, ১ অক্টেরবর, ১৯৭৪

ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৮৪ জনের লাশ দাফন।

–ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৪

উত্তরাঞ্চলে অনাহারে ও কলেরায় দৈনিক দেড় সহস্র লোকের মৃত্যু।

–ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর ১৯৭৪

"গত কয় বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের জাহাজ চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। অন্যূন্য ৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার হইয়া গিয়াছে, (এবং) শেখ মুজিব দেশব্যাপী ৫৭০০ লঙ্গরখানা খুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন" (ইত্তেফাক ২৭–মার্চ ১৯৭৫)।

"১৫ই আগষ্ট–এ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এর আগে সাড়ে তিন বছর ধরে ক্ষমাসীন স্বৈরাচারী সরকার এ দেশে শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের এ ভয়াবহ রাজত্ব কায়েম করেছিলো। এই সময়ে বাংলাদেশে ঘটেছে ভয়াবহ মন্বন্তর।

সরকারী হিসেবে বলা হয়েছে, এই মন্বন্তরে সাড়ে সাতাশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারীভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে জানা গেছে '৭৪ –এর দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও বেশী।

'এই দুর্ভিক্ষের সূচনা ঠিক চুয়াত্তরে হয়নি, হয়েছে আরো আগে থেকে। বলা যেতে পারে ৭২ সালেই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল গ্রাম বাংলায় যখন চালের দর প্রতিদিন ধাপে ধাপে বাড়ছিলো, সেই সংগে বাড়ছিলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর এবং ক্রমশ সেগুলো চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। হাজার হাজার কোটি টাকার ধান পাট বিদেশে পাচার হয়েছে চোরা পথে। রাষ্ট্রায়ত্ত কল–কারখানায় দুর্নীতি পরায়ণ প্রশাসকরা, যারা

www.pathagar.com

ছিলেন ক্ষমাসীন সরকারের প্রতিনিধি শুরু করলেন অবাধ লুণ্ঠন, বিক্রি করে দিলেন বস্ত্র ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল অন্যান্য শিল্প সামগ্রী।

"জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো সম্পূর্ণ ভেংগে পড়লো। বিদেশ থেকে আমদানী করা কয়েক হাজার কোটি ডলারেও সেই ঘাটতি পূরণ হলো না, বরং বিদেশী ত্রাণ সামগ্রীও পাচার হয়ে গেল সীমান্তের ওপারে।

"দুদিনেই আরম্ভ হল লুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এডমিনিষ্ট্রেটার, পারচেজ অফিসার, ম্যানেজার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতাদের যোগ সাজসে প্রায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেই লুট করতে আরম্ভ করল। ফলে দফায় দফায় জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। এক একটি পাটকল ও বস্ত্র কলে দ্বিগুণ আড়াই গুণ শ্রমিক নিয়োজিত হলো। শ্রমিক ভাতার ব্যাপারে কারচুপির অন্ত রইলো না। বহুস্থানে অস্তিত্বহীন শ্রমিকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মাহিনা নেয়া হতে লাগল। পাটকলগুলিতে পাট ও খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা অপচয় হতে লাগল। সার্বিক অব্যবস্থার ফলে পাটের দর অসম্ভব কমে গেল। কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হলো। অল্পদিনেই বুঝা গেল ভারতের যেখানে পাট কলগুলি দক্ষ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাতে রয়েছে সেখানে বাংলাদেশে পাটকলগুলি জাতীয়করণ করে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য পরিচালকদের দ্বারা পরিচালনা করা মস্ত বড় ভুল হয়েছে। বিশ্ব বাজারে আমরা বাজার হারাতে লাগলাম আর সে স্থান দখল করল ভারত। পাটকল জাতীয়করণ করার সময় এটা মোটেই খেয়াল করা হয়নি যে, পৃথবীতে আমরাই একমাত্র পাট উৎপাদনকরী দেশ নই।

বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারেও একই ব্যাপার ঘটেছে। তুলা কেনা ও সুতা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট হলো। জাতীয়করণকৃত বস্ত্র কলের এক একজন ম্যানেজারের গড়ে মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজারে এসে দাঁড়াল। অধিকাংশ সুতা কালো বাজারের মারফত সরকারী মূল্যের উপর রেল প্রতি দেড় থেকে দুই হাজার টাকার অধিক মূল্যে তাঁতীদের হাতে পৌছতে লাগল। বাড়লো তাঁতীদের দুর্গতি, জাতীয়করণ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতি লন্ড ভন্ড করে দেওয়া হলো। (এম এম মোহাইমেন ঃ 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ' পৃঃ -১৪)

'১৯৭২ সনে অবাঙ্গালীদের পরিত্যাক্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে কোন প্রকার ইনভেন্ট্রি তৈরী না করেই যাকে তাকে পরিচালক বানিয়ে সেগুলি চালাতে দেওয়া হলো। ইনভেন্ট্রি তৈরী না করে চালাতে দেওয়ার দরুন কারখানা চালু করার সময় তৈরি মালের

www.pathagar.com

স্টক কত ছিলা তা আর কারও জানবার উপায় রইল না। ফলে আরম্ভ হলো যথেচ্ছ লুট। তখন এক একটি কল কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার তৈরী মাল ছিল। একাত্তরে স্বাধীনতা সংগ্রমের সময় দেশবাসী যুদ্ধ চলার দরুন উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি সম্ভব না হওয়ায় বহু কারখানাতেই প্রচুর উৎপাদিত মাল জমা হয়েছিল। '৭২ এর প্রথম থেকেই ঐ সমস্ত মাল লুট হতে আরম্ভ হলো। লুট প্রথম আরম্ভ করলো ১৬ ডিভিশন নামে ভুয়া মুক্তি যোদ্ধারা। তারপর আরম্ভ করল পরিচালনায় যারা নিয়োজিত হয়েছিল তারা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গোরা। এত সম্পদ বাঙ্গালী যুবকেরা কখনও এক সংগে চোখে দেখেনি। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই লুটের একটা সর্বগ্রাসী বন্যায় দেশ তলিয়ে গেল।

সে বন্যায় কোথায় ভেসে গেল বাঙ্গালী যুবকদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা। তারপর আরম্ভ হলো লুণ্ঠিত অর্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি।' (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ– পৃঃ ৪৪)

'এদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল যে, ভারত মনেপ্রাণে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মঙ্গল কোন দিন চায়নি। শুধু পাকিস্তানকে ভাঙ্গবার লক্ষ্যেই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এত সাহায্য করেছিল, এদেশের লোকের সত্যিকার মুক্তির জন্য সাহায্য করেনি। তাদের এ ধারণা সত্য কি মিথ্য সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে যখন বাংলাদেশ হয় তখন দেশের অধিকাংশ লোকের মনোভাবই এরূপ ছিল। ঠিক এ সময়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এ ধরনের বক্তব্য ও আচরণে অধিকাংশ প্রবীণ ও বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা হলো আওয়ামী লীগ ভারতীয় চিন্তা ও প্রভাবে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে কার্যকারণে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে লাগল যে ভারতীয় স্বার্থ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস আওয়ামী লীগের নেই।

ভারত ও বাংলাদেশ এর মধ্যেকার কতগুলি বিরোধের বিষয়, যেমন ফারাক্কা, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা ও তালপট্টির ব্যাপারে আওয়ামী লীগের একান্ত নীরবতা, যেটা জনমনে এই দলের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

(এম এ মোহাইমেন ঃ 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ'– পৃঃ ৪৪)

তাই গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত বাংলাদেশ বলে আসছে নেপালের সংগে মিলে নেপালের পার্বত্য এলাকায় বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য। এভাবে বাঁধ দিলে প্রচুর পানি

www.pathagar.com

সংরক্ষণ করা যাবে যা দিয়ে খরা মওসুমে ভারতের ও বাংলাদেশের উভয়ের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। এটি একটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনা এবং ভারত ও নেপাল রাজি হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে দিতে ওয়ার্লড ব্যাংক সম্মতি জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত নেপালের সহযোগিতায় ফারাক্কার পানি সমস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যার সমাধানে রাজি হচ্ছে না। ভারতের এ মনোভাবকে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করে। বাংলাদেশকে দুর্বল প্রতিবেশী পেয়ে ভারত ইচ্ছামত যাচ্ছে তাই ব্যবহার করছে মনে করে বাংলাদেশের লোক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মানুষ সাধারণভাবেই আশা করেছিল সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে একটা বক্তব্য রাখবে এবং বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য ভারতকে অনুরোধ জানাবে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি।

(এম এ মোহাইমেনঃ বাংলাদেশের রাজনীতি ও আওয়ামী লীগ' –পৃঃ ৪৫)

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম সমিতি ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে ২৯৩৪টি লাশ কুড়িয়েছে সবগুলিই বেওয়ারিশ। এগুলোর মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশী রাস্তা থেকে কুড়ান। ডিসেম্বরের মৃতের সংখ্যা জুলাইয়ের সংখ্যার সাতগুণ এবং অক্টোবরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কুড়ান সংখ্যারও প্রায় দ্বিগুণ।

গ্রাম–বাংলার ছিন্নমূল হতাশ মানুষেরা আজ ঢাকার পেশাদার ভিখারীদের স্থান নিয়েছে। পিতা শিশুদের নিয়ে রাস্তার চত্তরে নির্জীব এর মত বসে আছে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে। (পিটার গিলী, ডেইলী টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ৬ই জানুয়ারী১৯৭৫)

স্পষ্টতঃই বাংলাদেশে পরাজয়ের সংগ্রাম চলছে। দিনে দিনে বাংলাদেশ আরো গরীব হচ্ছে। কল্পনা করা শক্ত কিন্তু বাস্তব এটাই যে,আজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার সময়কার অবস্থা থেকে অনেক শোচনীয়। খাদ্য ঘাটতি আগের চেয়ে অনেক বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট – এর উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। শিল্প উৎপাদন এখনো ১৯৬৯–৭০ এর মাত্রায় পৌছায়নি– যদিও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক মিলিয়ন।

সুবিস্তৃত ইউ,এন, এইড অপারেশন–এর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ টনী হেগেন হিসাব করে দেখেছেন যে, রিলিফ সামগ্রীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রকৃত দুঃস্থ

www.pathagar.com

লোকদের হাতে পৌঁছেছে।

(কেভিন বিফার্টি ফিনান্সিয়াল টাইম লন্ডন, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৫)

বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।

অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দল দাবী করেছিল. এই ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিনদিন সময় দেওয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাশ করলেন যে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না।

(পিটার সিম্প ডেইলী টেলিগ্রাম, লন্ডন, ১৯৭৫)

কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও নব্যশাসকরা অধিকতর অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ন এবং লোভী– এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তিরা উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে, 'স্বাধীন' বাংলাদেশ অগ্রতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষেরা তা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন হ'ল তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোন দেশে সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। (ফ্রান্টিয়ার কোলকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী)

আওয়ামী লীগের উপর তলায় যারা আছেন, তারা আরো জঘন্য। যাদের মুক্ত করেছেন, সেই জনসাধারণের মেরুদন্ড ভেংগে তারা আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছেন।

(জনাথন ডিম্বলবী, নিউ ষ্টেটসম্যান, লন্ডন, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

বেসরকারী হিসেবে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে এ পর্যায়ে লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। লন্ডনের একটি প্রত্রিকার সংবাদাতা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা রংপুর গিয়েছিলেন। তিনি জানান যে শুধু এ এলাকায়ই ২৫ হাজার লোক মারা গিয়েছে। 'রিবিসি (ইত্তেফাক, ২ নভেম্বর, ১৯৭৪)

রিপোর্টে বলা হয়, প্রতি বছর ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টন চাল বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হয়। এর সবটুকু সরকারের হাতে এলে সরকারী বন্টন ব্যবস্থার ঘাটতি পুরণের জন্য যথেষ্ট হবে। খাদ্য উৎপাদন ও আমদানি বাবদ প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের কেবল উদ্বৃত্ত অংশ প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্য শস্য পাচার হয়েছে।

www.pathagar.com

(গার্ডিয়ান,লন্ডন, ৮ই নভেম্বর, ১৯৭৪)

এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এর হিসাব মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্নদেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।

ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ জানালেন, "স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়ত কয়েক ডজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি, কিন্তু এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি– সবই অনাহারজনিত মৃত্যু।"

যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু কঙ্কাল–বোধ করি হাজার হাজার। প্রথমে লক্ষ্য করিনি। পরে বুঝতে পারলাম অধিকাংশই কঙ্কাল শিশুদের।(–জন পিলজার, ডেইলী মেইল, লন্ডন ১৭ই ডিসেম্বর,১৯৭৪)

জরুরী অবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে শেখ মুজিব সেই পুরানো জুজুর ভয়ই দেখেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ সরকার যে সরকার ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম থেকে শাসন করে আসছে। ব্যর্থ হয়েছে– সে জন্যই জরুরী অবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকার যে ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমান দেখা যায় গ্রামবাংলায় যেখানে দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে, আর যারা বেঁচে আছে তারা সরকারের গুন্ডাবাহিনীর ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত। (ডেভিট হার্ট, ফারইস্টার্ন, ইকনমিক রিভিউ হংকং ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭১।)

www.pathagar.com

আওয়ামী বাকশালী দুঃশাসনের খতিয়ান

কালোবাজারী	৫ হাজার কোটি টাকার মালামাল
পাচার	২ হাজার কোটি টাকার মালামাল
জালিয়াতি	১৫ হাজার কোটি টাকার মালামাল
ব্যাংক লুট	৫ হাজারেরও বেশী
অস্ত্র লুট	দেড় শতাধিক (রাইফেল, এস এল আর, প্রভৃতিসহ প্রায় ১৫ হাজার)
ধর্ষণ	প্রায় ১৫ হাজার
সরকারী মিথ্যা আশ্বাস	প্রায় ১২ হাজার
অবৈধদখল	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ঘর বাড়ী মিলে প্রায় ১৩ হাজার, জমি ৫০ হাজার একর
সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা	৪ শতাধিক
দুর্ভিক্ষে মৃত্যু	১০ লাখ লোক
পুষ্টিহীনতায় মৃত্যু	২ লাখ লোক
বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু	১ লাখ লোক
জেলখানায় মৃত্যু	৯ হাজার লোক
আওয়ামী–বাকশালী গুন্ডা ও রক্ষিবাহিনীর নির্যাতনে মৃত্যু	২৭ হাজার লোক
রাজনৈতিক হত্যা	১৯ হাজার লোক
গুম/খুন	১ লাখের উপর লোক
পিটিয়ে হত্যা	৭ হাজার লোক
আওয়ামী গুন্ডা ও রক্ষিবাহিনীর নির্যাতনে পঙ্গু	২৬ শত লোক
গ্রেফতার ও নির্যাতন	২ লাখ লোক
হাইজ্যাক/ছিনতাই	২২ হাজারটি
চুরি–ডাকাতি/রাহাজানী/লুটপাট	৬০ হাজার
আগুন লাগানো হয়েছে	৭২ টি পাটের গুদাম।

www.pathagar.com

দেশ বরেণ্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক, খ্যাতিনামা রাজনীতিবিদ এবং খোদ আওয়ামী লীগ নেতা এম, এ, মোহাইমেন স্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা কালীন জাতিকে কি দুঃসহ শ্বাশরুদ্ধকর অবস্থায় নিপতিত করেছিল। দেশপ্রেমিক যারা তারা কখনোই সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তচক্ষুর কাছে মাথা নত করেনা। আর ক্ষমতা প্রেমিক ও সুবিধাবাদী যারা তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে বা ক্ষমতাধরদের উচ্ছিষ্ট পাওয়ার লোভে ন্যুনতম নীতিটুকুও বিসর্জন দিতে কুন্ঠাবোধ করেন না।

১৯৮২ সনের ২৪ শে মার্চ বাংলাদেশের বঙ্গভবনে এক রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হয়। উক্ত ডাকাত দলের অধিনায়ক ছিলেন আত্মপ্রচারে সুখী ডবল হাজী এরশাদ সাহেব। তিনি রাতের অন্ধকারে চোরের মত, ডাকাতের মত, হাইজ্যাকারের মত জনগণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত একটি বৈধ সরকারকে বন্দুকের নলের খোচা দিয়ে উৎখাত করে মরহুম সাত্তার সাহেবের কাছে থেকে ক্ষমতা ছিনতাই করলেন। এ সময়েও আওয়ামী নেতা-নেত্রী পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে ছিনতাইকারী এরশাদের পক্ষ নিয়ে জনগণের মৌলিক অধিকার পদদলিত করলেন। কারণ একটাই, এরশাদ সাহেব ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'এর লোক ছিলেন। এরশাদ যতগুলি প্রোমোশন পেয়েছেন তার অনেকগুলিই ভারতের দেরাদুনে থাকতে পেয়েছেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে "ধরি মাছ না ছুই পানি" খেলা খেলে এদেশের তরুণ যুবকদের পুলিশ বিডিআর আর আর্মির অস্ত্রের খোরাকে পরিণত করেছে। আওয়ামী চক্র। এরা কোন দিনই চাইনি এরশাদ ক্ষমতা থেকে বিদায় নিক। নইলে ১৯৮৭ সনে ডিসেম্বরে প্রথম দিকে এরশাদকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করার জন্যে জামায়াত গণদাবী মেনে নিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করলো, তখনও আওয়ামী চক্র ক্ষমতার মোহে গণদাবী অগ্রাহ্য করে সংসদ থেকে পদত্যাগের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করলো। জামায়াত সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ফলে সংসদ মূল্যহীন হয়ে পড়ায় এরশাদ আওয়ামী লীগকে গলা ধাক্কা দিযে সংসদ থেকে বের করে সংসদ ভেঙ্গে দেয়। বিরোধী দলীয় ক্ষমতা হারিয়ে আওয়ামী নেতারা সারা দেশে ফ্যাসীবাদী কায়দায় জামায়াত শিবিরের উপর হামলা চালাতে থাকে। এরশাদ সাহেবও আওয়ামী চক্রের সুরে সুর মিলিয়ে তখন জামায়াতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে থাকে এবং প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে থাকে জামায়াত নেতা-কর্মীদের নির্যাতন করার জন্যে।

www.pathagar.com

আওয়ামী বাকশালী চক্রের পিতার ষড়যন্ত্রেই যে ৭১-এ বাংলার মাটি রক্তে রঞ্জিত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ ২৫ শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়িটি লোকে লোকারণ্য থাকতো আর সে বাড়ীটিই ২৫ তারিখে সন্ধ্যায় একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল এবং শেখ মুজিব একাই বাড়ীতে রয়ে গেলেন কেন? শেখ মুজিব পাকিস্তান সরকারের অনুমতি নিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত যোশেফ ফারল্যান্ডের সাথে বুড়ীগঙ্গায় নৌবিহার কালীন দুই দফা বৈঠক করে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? এই সেই ফারল্যান্ড যিনি ইন্দোনেশিয়ায় থাকাকালীন প্রেসিডেন্ট সুকর্নোর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা দিয়ে মাত্র একদিন একরাতে বারো লক্ষ মানুষ হত্যা করিয়েছেন। তার আগে ফারল্যান্ড ভিয়েতনামে থাকাকালীন লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। গণহত্যা বিশেষজ্ঞ ফারল্যান্ডের সাথে বাংলার মানুষদের কোন কায়দায় হত্যা করা যায় এ বিষয় ছাড়া শেখ মুজিব আর অন্য কোন বিষয়ে যে ছবক নেননি তার প্রমাণ ফারল্যান্ড-মুজিব বৈঠকের পরবর্তী ঘটনাবলী। জনগণের চোখে নিজেকে নির্দোষ রাখার জন্য শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন তার প্রমাণ ওরিয়ানা ফালাচির কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও মিলে।

৭১-এর ঘাতক আওয়ামী-বাকশালী চক্র সুযোগ পেলেই আবার তাদের হিংস্র নখর বিস্তার করবে বর্তমানে তার আলামত অত্যন্ত স্পষ্ট। ৯০-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে জনগণের কাছ থেকে গলাধাক্কা খেয়ে ইহুদী-মার্কিন এজেন্ট ডঃ কামাল নিজেদের ভরাডুবি কেন ঘটলো তার কারণ বিশ্লেষণ করে যখন পত্রিকায় বিবৃতি দিল তখন মুজিব কন্যা নিজের অবস্থানকে মজবুত করার জন্যে পদত্যাগ নাটকের নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে ডঃ কামাল কে ভিলেন সাজিয়ে আওয়ামী কর্মীদের হাত দিয়ে গণধোলাই দিলেন।

নির্বাচনে বার বার পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আওয়ামী লীগ' "তথ্য অনুসন্ধান কমিটি" গঠন করে। ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় কমিটি ১৮টি কারণ দেখায় পরাজয়ের এবং বিজয় তথা ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে ১৯টি পথ দেখায়। তার মধ্যে দুটি পথ হলো,

(১) আওয়ামী লীগের সংগে নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন যন্ত্র ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা

(২) প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে দলীয় প্রাধান্য বিস্তার করে ভোট গণনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

www.pathagar.com

ক্ষমতায় যাওয়ার কত জঘন্য পথ দেখিয়েছে আওয়ামী লীগের "তথ্য অনুসন্ধান কমিটি"। নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে জনগণের রায়কে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার জন্যে নির্বাচন পচিালনাকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদেরকে ভয়ভীতি বা লোভ দেখিয়ে তথা যে কোন উপায়ে সুসম্পর্ক গড়তে হবে। পেশী শক্তি প্রদর্শন করে হলেও ভোট কেন্দ্রে নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে, প্রয়োজনে ১৯৭৩ সনের মত হেলিকপ্টারে করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে এনে নিজেদের বিজয়ী প্রমাণ করতে হবে। এরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে এমন কোন জঘন্য পথ নেই যা অবলম্বর করতে পারে না। এতদিন যাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে দেশবাসীর কাছে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করেছে সেই জামায়াতে ইসলামীরও হাতে পায়ে ধরেছে আওয়ামী বাকশালীচক্র তাদের মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে ভোট দেওয়ার জন্যে। শুধু তাই নয় তাদের ভাষায় "আল বদর নেতা মাওলানা নিজামীর" পিছনে রাজনৈতিক নামাজও আদায় করেছে-তারা ইসলামপন্থিদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে।

১৯৭১-এর গণহত্যার নায়ক যারা তারাই আবার ইনডেমনিটি বিলের নামে শেখ মুজিব হত্যার বিচার চাচ্ছে। একজনের হত্যার ব্যাপারে অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। বিনা বিচারে হত্যা দূরে থাক কাউকে কারাগারে দিতেও ইসলাম অনুমতি দেয়নি। পক্ষান্তরে আওয়ামী বাকশালী চক্র ক্ষমতায় থাকাকালীন এবং ক্ষমতার বাইরে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে কয় হাজার হত্যা কান্ড ঘটিয়েছে, ওদের লুটপাটের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে যে কয় লক্ষ লোক মরেছে, হাজার হাজার মা বোন ধর্ষিতা হয়েছেন তাদের পক্ষে বিচারের বিল অবশ্যই সংসদে আনতে হবে। ঘাতক নায়ক শেখ মুজিব শিরাজ শিকদারকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "কোথায় আজ শিরাজ-শিকদার" এর বিচার করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতে আন্দোলনরত ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা মালেক ভাই সহ বর্তমান সময় পর্যন্ত আওয়ামী বাকশালীচক্রের হাতে নিহত জামায়াত শিবির কর্মী তথা ইসলামপন্থিদের হত্যাকান্ডের বিল অবশ্যই সংসদে আনতে হবে। ৭১-এ অন্যায়ভাবে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল, জেল-জুলুম নির্যাতন সহ সব ধরনের অপরাধের বিচার না করলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্তও রছুলে আওলাদ মাহমুদ মোস্তফা আলমাদানীর রক্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রই একদিন সব জালেমদের বিচার করবে ইনশাল্লাহ।

www.pathagar.com

আস্ সাম্স আলবদর ও রেজাকার গঠনের প্রয়োজনীয়তাঃ একটি জাতিকে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করতে হলে বহুপূর্বে থেকে সেই জাতিকে প্রথমে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করতে হয়। আর সে স্বাধীনতা যদি অস্ত্র হাতে নিয়ে রক্ত দিয়ে অর্জন করতে হয় তাহলে গোটা জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সম্ভাব্য সবধরনের ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা প্রথমে তৈরী করে নিয়ে স্বাধীনতার ডাক দিতে হয়। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে কোন প্রকার ধারণা না দিয়েই গোটা জাতিকে বিশ্বের অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনীর অস্ত্রের মুখে ফেলে তাদের প্রভুর দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বেই উর্দূভাষী মুসলিমদের নির্বিচারে নিষ্ঠুর হত্যা শুরু করে। ফলে জীবিত উর্দূভাষী মুসলিমদের মনে বাংলাভাষী মুসলিমেদের প্রতি তীব্র ঘৃনা সৃষ্টি হয় এবং তারা পাক সেনাবাহিনীকে তাদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের চিহ্ন ও উর্দূভাষী মুসলিমদের হত্যা করার বধ্যভূমি দেখিয়ে দিয়ে বাংলাভাষী মুসলিমদের প্রতি উর্দ্দুভাষী পাকবাহিনীর মন–মানসিকতা হিংস্র করে তুলে "বাঙ্গালীদের দেখামাত্র গুলি" এমন নিষ্ঠুর প্রবণতার জন্ম দেয়। এর ফায়দা লুটতে থাকে ভারত। কেননা উর্দূভাষী মরুক আর বাংলা ভাষী মরুক সবদিকেই তাদের লাভ। কারণ মরছে তো মুসলমান, আর মুসলমান মানেই ভারতের দৃষ্টিতে তাদের শত্রু। এযেন কুমির দিয়ে বাঘ শিকার– কুমির মরলেও শত্রু কমলো এবং বাঘ মরলেও শত্রু কমলো।

মেজর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বেশ কিছু দিন পূর্ব থেকেই রুশ–ভারত অক্ষশক্তির পা–চাটা গোলামেরা বিহারী মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করতে থাকায় বিহারীদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা সৃষ্টি হয়। ভুট্টো–মুজিব ষড়যন্ত্রের কারণে ব্যারাক ছেড়ে পাকবাহিনী যখন ময়দানে নেমে বিহারীদের এই করুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তখন তারাও অন্যায়ভাবে নিরীহ বাঙ্গালীদের পাইকারী দরে হত্যা শুরু করে। বাংলাভাষী মুসলিমদের ঘড়বাড়ী জ্বালানো ও বিষয় সম্পত্তি ধ্বংশে তারা মেতে উঠে। বাঙ্গালীদের প্রতি পাকবাহিনীর ক্ষোভের আরও একটি কারণ হলো, "জয় বাংলা" শ্লোগান শুনে তারা ধারণা করতে বাধ্য হয, পূর্ব পাকিস্তানের সব মানুষ হিন্দু–ভারতের দালাল হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় জাতিকে রক্ষা করার জন্যে জামায়াতে ইসলামী সহ

www.pathagar.com

ইসলামপন্থী দল সমূহ পাকবাহিনীকে অনর্থক হত্যাকান্ড থেকে বিরত রাখার জন্যে আস্ সামস্ আল-বদর রেজাকার বাহিনী গঠনে সহযোগীতা করে। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর; সেই অনুসারে আল বদর নামে বাহিনী গঠন করা হয়। আস সামস আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ সূর্য। শব্দ রাজাকার নয়, রেজাকার। ফার্সী শব্দ, বাংলা অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। এ সমস্ত বাহিনী গড়ার প্রধানতম কারণ হলো ভারতীয় সম্প্রসারণের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা ও পাক বাহিনীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। অরাজকতার সুযোগ নিয়ে দেশের এক শ্রেণীর চোর ডাকাতের হাত থেকে জনগণের জান-মাল রক্ষা করাও ছিল উল্লেখিত বাহিনী গঠনের আরো একটি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উল্লেখিত বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল খুবই ভালো। পক্ষান্তরে উল্লেখিত বাহিনী গঠনের সময় ইসলামপন্থি দল সমূহের মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই ছিল ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন। জামায়াতের কর্মীদেরই কেবল উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ ছিল। যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গেলে ঐ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গঠিত এক দল চরিত্রবান ও ত্যাগীকর্মী বাহিনী প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে ৭১-এ জামায়াতের বর্তমান সময়ের সংখ্যার দিক দিয়ে এত বেশী উন্নত চরিত্রের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাহিনী ছিলনা। তদুপরি রাজাকার বাহিনীতে লোক ভর্তির ঘোষণা দেয় পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও আর্মী। ফলে ইসলামের শত্রুরাও ইসলামপন্থীদেরকে যাবতীয় কু-কর্মের হোতা হিসাবে পরিচিত করার সুযোগ পেয়ে তারা দলে দলে রেজাকারে নাম দেয় যার অধিকাংশই ছিল আওয়ামী কর্মী তথা রুশ ভারত অক্ষশক্তির সেবা দাস। এরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাকবাহিনীকে ভুল বুঝিয়ে নিজেরাও পাকবাহিনীর দ্বারা জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়ে ইসলামপন্থিদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। রেজাকারে প্রবেশ দ্বার অবারিত উন্মুক্ত থাকার ফলে এক শ্রেণীর নরপশু চোর ডাকাতরা টাকার লোভে রেজাকারে নাম দিয়ে অবাধে লুট করে। এমন অনেক জায়গা বাংলাদেশে আছে যেখানে ১৯৭০ সনের নির্বাচনে সমস্ত ইসলামী দল একক ভাবে প্রার্থী দিয়েও ১০০/২০০ শতের বেশী ভোট পায়নি। অথচ সেখানে দেখা গেছে রেজাকারের সংখ্যা দশ হাজার বিশ হাজার পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। যেখানে ইসলামপন্থীরা ভোট পেল মাত্র ১০০/২০০ শত আর সেখানে রেজাকারের সংখ্যা হলো কয়েক হাজার এর কারণ কি? ইসলামের দরদী হয়ে এত লোক এলো কোথায় থেকে?

www.pathagar.com

এই নতুন লোকগুলি নিশ্চয়ই জামায়াত প্রতিক দাড়িপাল্লার ভোটার নয়– তারা সব আওয়ামী প্রতিক নৌকার ভোটার ছিল। দেশের অনাগত নতুন প্রজন্মদের কাছে ইসলামপন্থীদের দাগী আসামী করে রাখার জন্যই রুশ–ভারত অক্ষশক্তির এদেশীয় গোলামেরা সুযোগ মতো রেজাকারে লোক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের দ্বারা যাবতীয় অপকর্ম করিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে দোষী বানানোর অপচেষ্টা করছে।

সুতরাং দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আল বদর, আস সামস ও রেজাকার বাহিনী গঠন করা হয। আর জামায়াতে ইসলামী সহ ইসলামপন্থী অন্যান্য দলগুলির এই মহৎ উদ্দেশ্য ইসলামের শত্রুরা বানচাল করেদেয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে এলাকার যুবকদেরকে দুইভাগে ভাগ করে একভাগ দিয়েছে রেজাকারে আর এক ভাগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে। যাতে করে এলাকার ছেলে রেজাকারে থাকার কারণে সেই এলাকায় পাকবাহিনীর অত্যাচার না হয়। এবং রেজাকারদের দ্বারা মুক্তিযোদ্ধারাও উপকৃত হয়ে শীঘ্রই যেন দেশ স্বাধীন হয়। এভাবে করে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে অনেক লোক উপকৃত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারা জামায়াতে কেন?

অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে জানবাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশ স্বাধীন হবার পর যখন তারা সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে না দেখে হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের লক্ষ্যই ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধশালী শোষণহীন নিরাপত্তাপূর্ণ ভিতিহীন সমাজ ব্যবস্থা পাওয়ার– যেখানে দেশের মানুষ দু'বেলা পেটভরে খেতে পারবে ইজ্জত ঢাকার জন্যে একটুকরো মোটা কাপড় পাবে। পক্ষান্তরে তাদের সে মহৎ উদ্দেশ্য যখন বাস্তবায়িত হলোই না তখন তারা হতাশ হয়ে বসে না থেকে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির দিকে দৃষ্টি দিল। যে সব মুক্তি যোদ্ধারা তাদের আশা–আকাংখার বাস্তব প্রতিফলন জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে দেখতে পেয়েছে বা পাচ্ছে তারা দলে দলে জামায়াতে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। স্বাধীনতার সোল

www.pathagar.com

এজেন্সীর দাবীদাররা যদি আজ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ ডাক দেয় আর জামায়াতে ইসলামীও যদি মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ এর আয়োজন করে তাহলে জামায়াতের কাছে স্বাধীনতার সোল এজেন্সীর দাবীদাররা লজ্জা পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

জামায়াত শিবিরের বিরোধিতা কেন?

জামায়াত শিবির দেশের ক্ষমতা পেলে তারা কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে দেশ গড়ে মানুষের মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দিয়ে দেশ থেকে যাবতীয় শোষণ জুলুম তথা সকল প্রকার অন্যায়ের পথ বন্ধ করে দিবে। ফলে মানুষকে ঠগিয়ে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে কালো টাকার মালিক সেজে বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে শরীর ভাসিয়ে দেয়া যাবে না। নারীদেরকে স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে রাস্তায় টেনে বের করে ইচ্ছেমত তাদের যৌবনকে ব্যবহার করা যাবে না। কৃষক–শ্রমিকদের জমি কারখানার মালিক বানিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদেরকে জমি কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নেতা সেঁজে মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ মীমাংসাকারী হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে চাঁদা ও মালিকদের পক্ষ থেকে ঘুষ খাওয়া যাবে না। অবৈধ পয়সায় দেশের অভিজাত এলাকায় সুরম্য অট্টালিকা গড়া যাবে না। ইসলামের নাম ভাংগিয়ে ভন্ডপীর সেজে জনগণের অর্থ শোষণ করা যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় নিজের কলুষিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না ইত্যাদি কারণেই জামায়াত শিবিরেরবিরোধীতা।

কারা জামায়াত শিবির বিরোধী?

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা যে ধরনের চরিত্র বৈশিষ্টের অধিকারী লোকেরা করেছে বর্তমানে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও পৃথিবীর সকল স্থানে ঐ একই ধরনের চরিত্র বৈশিষ্টের অধিকারী লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা করবে। বাংলাদেশে জামায়াত শিবির যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন সেহেতু জামায়াত শিবিরের বিরোধীতা আসাটা স্বাভাবিক।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর শক্তি ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা করে থাকে।
প্রথমতঃ ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি। তৃতীয়তঃ সমর্সাময়িক খোদাহীন রাষ্ট্র শক্তি। এই তিন গোষ্ঠীই পরস্পরের সম্পুরক। এরা ঐ ইসলামকে খুবই ভালোবাসে এবং মাঝে মধ্যে সহযোগীতাও করে থাকে,যে ইসলাম শুধুমাত্র নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত তসবিহ তাহলিল দাঁড়ি টুপি, পাগড়ী পাঞ্জাবী, মসজিদ মাদ্রাসা খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সে ইসলামকে এরা খুবই ভালোবাসে। এজন্যে তারা তাবলিগ জামাতকে খুবই সুনজরে দেখে। কিন্তু যে ইসলাম ক্রেমলিন, হোয়াইট হাউজ, ত্রিমুর্তি ভবন, বঙ্গভবন তথা গোটা বিশ্বের মাথায় বসে গোটা বিশ্বকে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন বানাতে চায়, যে ইসলাম রাজনীতির অংগন, অর্থনীতির অংগন, শিক্ষানীতির অংগন তথা মানুষের জীবনের সার্বিক অংগনে নেতৃত্ব দিতে চায় সে ইসলাম এই তিন গোষ্ঠির কাছে অপছন্দ।

স্বাধীন মানুষ কারা?

বর্তমানে আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন বলতে বড়ই গর্ববোধ করি কিন্তু তলিয়ে দেখি না সত্যই আমরা স্বাধীন কি–না স্বাধীনতার বিপরীত অবস্থাই হলো গোলামী। গোলামী সাধারণতঃ দুই প্রকারের, মানসিক গোলামী ও রাজনৈতিক গোলামী। বর্তমানে আমরা কি কারো গোলামী করছি না? বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, স্বাভাবিক কারণেই মানুষ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান মানতে বাধ্য নয়। এই মানুষ যখন আল্লার গোলামী বা দাসত্ব ছেড়ে দেয়, তখন মানুষ নিজের অজান্তেই অসংখ্য মনিবের গোলাম হয়ে পড়ে। মানুষ যখন জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর বিধান মেনে চলে না তখন মানুষ পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে গিয়ে কোন না কোন বিধান মেনে নিতে বাধ্য। জীবন তো আর বিধান ছাড়া এলোমেলো বিশৃংখল অবস্থায় চলতে পারে না। পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে অনেক আইন–কানুন প্রয়োজন হয়। মামলা মোকদ্দমা চালাতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হয়। এ সমস্ত আইন বা বিধানগুলি যদি কোরান–সুন্নার বিধান না হয় তাহলে প্রচলিত বিধানগুলি কেউনা কেউ অবশ্যই তৈরী করবে। আর মানুষের জন্যে বিধান তো পশু তৈরী করতে পারে না। মানুষই তৈরী করে। যেহেতু কোন বিধান ছাড়া মানুষ কিছুতেই জীবন ধারণ করতে পারে না সেহেতু আল্লাহর বিধান মেনে না চললে কোন মানুষের তৈরী বিধান মেনে চলতেই হয়। তাহলে

www.pathagar.com

একজন মানুষ যখন অন্য একজন মানুষের তৈরী বিধান মেনে চলে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে অন্য এক মানুষের দাস বা গোলাম হয়ে পড়ে। কোন মানুষ বা কোন জাতি যখন অন্য কোন মানুষ বা জাতির জীবন ধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করে তখন সে মানুষ বা জাতি আর এক মানুষ বা জাতির গোলাম হয়ে পড়ে। মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে মানুষ যখন কোন আইন-কানুন, জীবন বিধান তৈরী করে তখন সেই আইন-কানুন বা জীবন বিধানে ভুল থাকা স্বাভাবিক। নির্ভুল পক্ষপাতহীন সমতা রক্ষাকারী বিধান তৈরী মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই মানুষের তৈরী কোন আদর্শ, মতবাদ সমাজ বা রাষ্ট্রে চালু হলে সেই সমাজ বা রাষ্ট্রে মানুষ মানুষের প্রভু বা খোদা হয়ে দাঁড়ায়। আর যে সমাজে মানুষ মানুষের প্রভু হয় সে সমাজ কোনক্রমেই জুলুম মুক্ত হয় না। আইন-কানুন বিধান তৈরী করতে সব মানুষ পারেনা বা সে সুযোগও পায়না। সমাজ রাষ্ট্রের পরিচালক যারা তারাই নিজের মন মস্তিষ্কের ধারনা অনুযায়ী আইন-কানুন তৈরী করে সমাজ বা রাষ্ট্রের অসংখ্য মানুষকে সেই আইন-কানুন মানতে বাধ্য করে। হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ আইন তৈরী করলো আর সেই আইন মেনে চলতে অসংখ্য মানুষ বাধ্য হলো। তাহলে যারা সেই আইন গ্রহণ করলো তারাতো হয়ে গেল আইন প্রণেতা সামান্য কয়েকজন মানুষের গোলাম বা দাস, আর এই দাসত্ব করতে গিয়ে হয়ে পড়লো পরাধীন। অসংখ্য মানুষ গুটি কয়েক মানুষের কাছে স্বাধীনতা বন্ধক দিয়ে পরাধীন জীবন যাপন করার ফলে অগনিত জুলুমের শিকার হয়। এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই পৃথিবীতে আল্লাহ নবী রাসূল (আঃ) পাঠিয়েছেন। মানুষ আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে যাবার সাথে সাথেই প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, নেতা সমাজপতি নিজের স্ত্রী, নফস, শক্তিমান ব্যক্তি তথা অসংখ্য শক্তির গোলামে পরিণত হয়ে পরাধীন জীবন যাপনে মানুষ বাধ্য হয়। এখন আমরা কি আল্লাহর আইন মেনে চলে নিজেদের স্বাধীন রাখতে পেরেছি? ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে সকল প্রকার গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামে পরিণত করা। মানুষকে মানুষের তৈরী শৃংখল থেকে মুক্ত তথা স্বাধীন করে দেওয়া।

যারা একমাত্র আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন শক্তির আইন মেনে চলে না তারাই কেবল মাত্র স্বাধীন মানুষ। যে দিন আমরা সমস্ত মতবাদ মতাদর্শ আইন-কানুনকে কবর দিয়ে কেবল মাত্র আল্লাহর আইন কানুনকে জীবনের

www.pathagar.com

সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে পারবো সেই দিনই আমরা প্রকৃত স্বাধীন হতে পারবো স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারবো। ১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এ দুইবার আমাদের ভাষায় স্বাধীনতা পেয়েও আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা না পাবার মূল কারণ হলো আমরা মানুষকে প্রভু বানিয়েছি, আল্লাহর আইন ছেড়ে দিয়েছি। যারা মানুষের প্রভু সেজে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে চায় তাদের সাথেই চলছে জামায়াত শিবিরের সংঘাত। প্রভুত্বের দাবীদার মানুষদের কাছেই জামায়াত শিবিরের নেতা-কর্মীরা আতংকের কারণ। প্রভূত্বের দাবীদার গুটি কয়েক মানুষ যখনই ক্ষমতা হাতে পেয়েছে তখনই যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীর উপরে চালিয়েছে নিষ্ঠুর নির্যাতন। ইসলামী আন্দোলনের অসংখ্য নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছে, জেলে দিয়েছে, নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে। বাংলাদেশেও ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এদেশের তৌহিদীজনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর, মজলুম মানুষের নেতা, ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন অগ্র সৈনিক বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযমও এই প্রভুত্বের দাবীদার গুটি কয়েক মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে এদেশের শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতীত সাধারণ মানুষদের কাছে যেতে পারছেন না মানব মুক্তির মহাসনদ আল কোরানের দাওয়াত নিয়ে।

গোলাম আযম ভীতি কেন?

১৯৭১ সনে জালিম শাষক বাংলাদেশের বুকে যুগের ফেরাউন শেখ মুজিব অন্যায়ভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণ করার অপরাধে নাকি গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। শুধুমাত্র গোলাম আযমের নাগরিকত্বই শেখ মুজিব বাতিল করেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্যে '৭১ এ যারাই ময়দানে সক্রীয় নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের অধিকাংশেরই নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। অবস্থা দেখে মনে হয় নাগরিকত্ব যেন শেখ মুজিবের পৈতৃক সম্পদ ছিল।

যে শাসকই ইসলামের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের উপরে জুলুম করেছে সে শাসকই জুতা পিটা খেয়ে লাঞ্ছিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই নমরুদ ফেরাইন, বিংশ শতাব্দির রেজাশাহ পাহলবী, জামাল আবদুন নাছের,

www.pathagar.com

আনোয়ার সাদাত, হাফিজুল্লাহ আমিন, নুরমোহাম্মদ তারাকী, জুলফীকার আলী ভুট্টো, ইন্দ্রিরা গান্ধী, শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান কেউ ইতিহাসের অমোঘ শাস্তি থেকে রেহায় পায়নি। রেহায় পায়নি স্বৈরাচারি এরশাদও। এরা সবাই অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযমকে পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে আজও পর্যন্ত প্রচার করছে ইসলামের শত্রুরা। যারা বলে গোলাম আযম পাকিস্তানী নাগরিক, তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, আপনারা ৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর এর পূর্বে কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? গোলাম আযমের দোষ (?) তো মাত্র একটিই আর তাহলো তিনি এই দেশে আল্লাহর কোরান ও রাসূল (দঃ)–এর সুন্নাহ বাস্তবায়িত করতে চান।

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ সনের ৭ই নভেম্বর (বাংলা ১৩২৯ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ) ঢাকা শহরের লক্ষী বাজারস্থ বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার শাহ সাহেব বাড়ী (মিয়া সাহেবের ময়দান নামে পরিচিত) মাতুলালয়ে এই ক্ষনজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম মওলানা গোলাম কবীর এবং আম্মার নাম সাইয়েদা আশরাফুন্নেছা। তাঁর পিতামহ ছিলেন মাওলানা আবদুস সোবহান। তাঁদের আদি নিবাস কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানাধীন বীরগাঁও গ্রামে। মাতৃল বংশের দিক দিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম ঢাকা মহানগরীর ঐতিহ্যবাহী শাহ সাহেব পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। তার মাতামহ ছিলেন শাহ সাইয়েদ আবদুল মেনয়েম।

১৯৩৭ সনে তিনি প্রথম বিভাগে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে জুনিয়ার পাশ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ সালে গোলাম আযম দশম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে আই, এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে গোলাম আযম প্রাচ্যের অক্স ফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করেন এবং ১৯৫০ সনে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম, এ পাশ করেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের দাদা মাওলানা আবদুস সোবহান অধ্যাবসায়ী আলেম ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি কোরআন শরীফ পড়া শিখেন। তার পিতার মধ্যে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পৃথিবীতে জীবন–যাপন করতে গিয়ে ইসলামকে অনুসরণ করার উপর এত গুরুত্ব দিতেন যে, অধ্যাপক আযমের কোন ভাইকেই ছাত্র জীবনেও দাঁড়ি পর্যন্ত কামাতে দেননি– যদিও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং

www.pathagar.com

কলেজেপড়তেন।

আব্বার তাগিদ ও অনুপ্রেরণায় গোলাম আযম ৮ম শ্রেণী থেকেই ইসলাম সম্পর্কিত সাহিত্য পড়ায় মনোযোগী হন। ঐ কিশোর বয়স থেকেই তিনি মাসিক "নেয়ামত" পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ঐ পত্রিকায় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)–এর ইসলাম ভিত্তিক বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা তাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি বাংলা ভাষায় মওলানার প্রকাশিত সমস্ত বই যোগাড় করে পড়তেন।

এম, এ ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে তাঁর আব্বার অনুপ্রেরণায় তিনি তাবলীগ জামায়াতে যোগ দেন। পরীক্ষার পরে তিনি একাধারে তিন চিল্লায় বেরিয়ে পড়েন এবং ভারতের দিল্লীতে এক চিল্লারও বেশী সময় অতিবাহিত করেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি তমুদ্দুন মজলিস নামক একটি ইসলামী সংগঠনে যোগ দেন। চার বছর তিনি তাবলিগ জামায়াত ও তমুদ্দন মজলিশে একযোগে কাজ করেন। রংপুরে তিনিই তাবলীগ জামায়াতের প্রথম আমীর এবং তমুদ্দুন মজলিশের প্রথম দায়িত্বশীল ছিলেন। তমুদ্দুন মজলিশে থাকাকালীন অধ্যাপক আযম বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বিংশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হয়রত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)–এর কয়েকটি বই বাংলা ও ইংরেজীতে পড়ার সুযোগ পান। ১৯৫৪ সনে মার্চ মাসে সর্বপ্রথম তিনি গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক ইসলামের বীর সেনানী মরহুম আব্দুল খালেক (রঃ)–এর নিকট থেকে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান। তিনিই জামায়াতের সংগঠনে গোলাম আযমকে শামিল করে রংপুর শহর ও কলেজে জামায়াতে ইসলামীর শাখা পরিচালনা শিক্ষা দেন। ইমাম মওদূদী (রঃ)–এর বিশ্ব বিখ্যাত বিপ্লবী তাফসীর "তাফহীমূল কোরান" অধ্যায়ন করার উদ্দেশ্যে উর্দূভাষা শিখেন। সত্যানুসন্ধিৎসু মানষিকতা সম্পন্ন অধ্যাপক আযম উর্দু ভাষায় ইসলামের বিশাল সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়ে দেশের বুকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি ১৯৫৫ সনে রংপুর জেলে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর রুকন (সদস্য) পদ লাভ করেন। ১৯৫৫ সনে জুন মাসে গোলাম আযম রাজশাহী বিভাগের জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সনে মার্চ মাসে তিনি রাজশাহী বিভাগের আমীর ও একই সালের নভেম্বর মাসে তিনি জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পান। ১৯৫৭ সনে তিনি একাদিক্রমে দীর্ঘ তের বছর প্রাদেশিক সেক্রেটারী

www.pathagar.com

জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সনে অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র নেতা ছিলেন। ১৯৪৬–৪৭ সেসনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে ছাত্র সংসদের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। ১৯৪৭–৪৮ সেসনে ছাত্র নেতা গোলাম আযম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচিত সেক্রেটারী জেনারেল (জি, এস) ছিলেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় অধ্যাপক আযম ছিলেন সে আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ডাকসুর জি, এসও প্রথম সারীর ছাত্র নেতা হিসাবে তাকে ভাষা আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। ১৯৪৯ সনে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমন্যাসিয়াম ময়দানে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দেন। সে ঐতিহাসিক সভায় এদেশের সমস্ত ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ডাকসুর জি,এস হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযম লিয়াকত আলী খাঁনের কাছে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং পাঠ করেন। ছাত্র জীবন শেষ করেও তিনি ভাষা আন্দোলনে তার সক্রীয় কর্মতৎপরতা বজায় রাখেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে ১৯৫২ সনের ৭ই মার্চ গ্রেফতার হন। ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলার ফলে তিনি একমাস পরে কারামুক্ত হন।

১৯৫৫ সনে তিনি পুনরায় ভাষা আন্দোলনের কারণে গ্রেফতার হন এবং রংপুর জেলে দুমাস বন্দী থাকেন। জেলে যাবার ফলে তাকে চাকরী হারাতে হয়। কিন্তু তাঁকে চাকুরীতে পুনর্বহালের দাবীতে কলেজ ছাত্রদের অবিরাম ধর্মঘটের ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনর্বহাল করে চাকুরীতে যোগদানের জন্য আহবান জানাতে বাধ্য হন। অবশ্য তিনি তার চাকুরীতে যোগদানে রাজী হননি। তখন তিনি ইসলামী আন্দোলনের রক্তঝরা উত্তপ্ত অংগনে জানবাজী রেখে ঝাপিয়ে পড়েন।

প্রতিশ্রুতিশীল নেতৃত্বের কারণে অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৬৬ সনে পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্টের (পি·ডি·এম) পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ

www.pathagar.com

সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে গঠিত "ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি" (ডাক) ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকেও গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬৪ সনে স্বৈরাচারী আয়ুবশাহী জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করে। জামায়াত নেতা হিসেবে গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে লাহোর জেলে রাখা হয়। ১৯৬৪ সনের মার্চে গোলাম আযমকে মুক্তি দেয়া হলেও ঢাকায় ফিরে আসার পর বিমান বন্দরে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দীর্ঘ সাত মাস আটক রাখা হয়। পরে ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের মাধ্যমে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও পাক সরকার শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেয় না। আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকলেও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য পাক সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ভুট্টোর বিরোধীতার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। নিরীহ জনগণের উপর টিক্কা খাঁনের সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠে জালিম টিক্কার সামনেপ্রতিবাদজানান।

অধ্যাপক গোলাম আযম একজন দেশ বরেণ্য রাজনীতিবিদই শুধু নন, তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতেও তার বিরাট অবদান আছে। দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪২ সনে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ১৯৪৭ সনে তিনি জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৫৭ সনে এপ্রিলে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদনা বোর্ডের চেয়াম্যানের দায়িত্ব নেন। তিনি সম্পাদকীয় সহ বিভিন্ন কলামে নিয়মিত লিখতেন। বর্তমানেও তিনি দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, মাসিক পৃথিবী সহ বিভিন্ন পত্রিকায় মাঝে মধ্যে লিখেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক লিখিত বই এর সংখ্যা বর্তমানে ত্রিশটিরও উপরে। তার লিখা প্রতিটি বই-ই সুধী মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে ১৯৭১ সনের ২২শে নভেম্বর লাহোরে যান। বৈঠক শেষে ডিসেম্বরের তিন তারিখে করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হন। কিন্তু ভারতীয় বিমান

www.pathagar.com

বাহিনীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিমান বন্দরে বিমান নামতে না পারায় বিমানটি গতিপথ পরিবর্তন করে করাচী ফিরে যায়। সেখানেও বিমান অবতরণে বাধা থাকায় বিমানটি জেদ্দায় অবতরণে বাধ্য হয়। পরে গোলাম আযম করাচী ফিরে আসেন। ১৯৭২ সনে জালিম শাসক শেখ মুজিবর রহমান অধ্যাপক গোলাম আযমসহ বহু নেতৃবৃন্দের নাগরিকত্ব অন্যায়ভাবে বাতিল করে দেয়। ১৯৭২ সনের জুন মাসে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্যে লন্ডন যাবার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু ভুট্ট তার যাবার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। এমনকি তাকে হজ্বে যাবার অনুমতিও দেওয়া হয় না। অবশেষে জনমতের চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার তাকে ১৯৭২ সনের নভেম্বর মাসে হজ্বে যাবার অনুমতি দেয়। অধ্যাপক গোলাম আযম হজ্ব থেকে আর পাকিস্তানে ফিরে আসেননি। হজ্ব শেষে তিনি দুবাই, আবুধাবী, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া সফর শেষে ১৯৭৩ সনের এপ্রিলে লন্ডন যান। কিন্তু সেখান থেকে শেখ মুজিব তাকে দেশে আসতে দেয়নি। যে শেখ মুজিব ইসলামী আন্দোলনের নেতা গোলাম আযমকে বাংলার সীমান্ত পার হতে দেয়নি, সেই জালিম শেখ মুজিবকেই পৃথিবীর সীমান্ত পার হয়ে যেতে হয়েছে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে।

১৯৭২ সনের পরবর্তী ছয় বছর গোলাম আযম প্রধানতঃ লন্ডনে থেকেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে গিয়েছেন। ১৯৭২ সনের ডিসেম্বরে রিয়াদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামীক যুব সম্মেলনে প্রথম ডেলিগেট মিটিং-এ তিনি সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম অতিথি বক্তা হিসেবে ১৯৭৩ সনের জুলাই মাসে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক যুব সম্মেলনে ভাষণ দেন। ১৯৭৩ সনের আগষ্টে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইউ, কে ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। "ওভার সীজ গেষ্ট স্পীকার" হিসাবে তিনি ১৯৭৩ সনের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার মিচিগান ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "এম, এস, এ"-এর বার্ষিক কনভেশনে ভাষণ দেন। ১৯৭৭ সনের জুলাইতে তিনি ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত "আই, আই, এফ, এস, ও"-এর বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণদেন।

প্রবাশ জীবনে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবেও বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সনের এপ্রিলে রাবেতা আলম আল ইসলামীর উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন সমূহের আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

সম্মেলন, ১৯৭৬ সনের এপ্রিলে ইউরোপীয় ইসলামিক কাউন্সিলের উদ্যোগে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কণফারেন্স, ১৯৭৬ সনে ডিসেম্বরে ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে রিয়াদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক জুরিস প্রুডেন্সস সম্মেলন, ১৯৭৭ সনের এপ্রিলে কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। ১৯৭৩ সনের জানুয়ারীতে সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে তিনি প্রথম দেখা করেন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্রকে জাতির আদর্শ বলে ঘোষণা করায় বাংলাদেশের মুসলিমদের পক্ষ থেকে বক্তব্য নিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাহায্য চান এবং বাংলাদেশের সরকারের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্যেও অনুরোধ জানান যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়।

১৯৭৬ সনের ১৮ই জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকার এক প্রেস নোটে ঘোষণা দিল, "যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা নাগরিকত্ব ফিরে পেতে ইচ্ছুক তাদেরকে স্বরাষ্ট্রসচিবের নিকট আবেদন করতে হবে," অধ্যাপক গোলাম আযম যথারীতি নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্যে আবেদন করেন কিন্তু সরকার কোন জবাব দেয়নি, ১৯৭৭ সনে ১২ই জানুয়ারী তিনি পুনরায় নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্যে তদানিন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট আবেদন পত্র পাঠান, এবার তিন মাস পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে তার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। ১৯৭৮ সনের ১৫ই জানুয়ারী তিনি আবারো নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিকট আবেদন জানান কিন্তু জিয়াউর রহমান নাগরিকত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। জিয়াউর রহমান এদেশের ইসলাম প্রিয় জনগণের প্রিয় নেতা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করেননি, পক্ষান্তরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন জিয়াউর রহমানের পৃথিবীর নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছেন।

মজলুম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম অবশেষে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানী পাসপোর্টে তিন মাসের ভিসা নিয়ে নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশে ১৯৭৮ সনের ১১ই জুলাই আসেন। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তিনি ভিসার মেয়াদ তিন মাসের জন্য বৃদ্ধির আবেদন করেন। মঞ্জুর হয় মাত্র এক মাস, পুনরায় তিনি দুমাস

www.pathagar.com

মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। ভিসার মেয়াদ মাত্র তিনদিন থাকা অবস্থায় সরকার তাকে জানিয়ে দেয় তার আবেদন গৃহীত হয়নি। এমতাবস্থায় তিনি নাগরিকত্ব এর দরখাস্ত সহ নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন। কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকার ভিসার মেয়াদ মাত্র এক মাস বৃদ্ধি করে এই মজলুম নেতাকে জানিয়ে দেয় ১৯৭৮ সনের ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম প্রেসিডেন্ট এর কাছে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ১৯৭৮ সনের ২৮ শে নভেম্বর বাংলাদেশে অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই আবেদন পত্রে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনঃ–

ক) সকল বিচারে আমি একজন বাংলাদেশী। পাকিস্তানী পাসপোর্টে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হলেও আমি পাকিস্তানী নাগরিক নই।

খ) গত ছয় বছরে আমি পাকিস্তানে যাইনি।

গ) আমার কোন সম্পত্তি পাকিস্তানে নেই।

ঘ) বাংলাদেশের বাইরে আমার কোন সম্পদ–সম্পত্তি নেই।

ঙ) আমার স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততি বাংলাদেশী নাগরিক।

চ) আমার মরহুম পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে সম্পত্তি বাংলাদেশে রয়েছে সেটাই আমার একমাত্র সম্পত্তি।

মানুষ যত বড় অপরাধই করুক না কেন, দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার করা উচিত। বিচারে যে সাজা হয় অপরাধী সেই সাজাই পাবে। তাই বলে কারো জন্মগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না, কারো নাগরিকত্ব বাতিল করা যায় না। দ্যা গ্রেটেষ্ট জোক্ অব দিস্ সেন্চুরী, শতাব্দীর নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস রুশ ভারত অক্ষ শক্তির পা–চাটা সেবাদাস শেখ মুজিব রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গোলাম আযমসহ দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করে। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সবার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিলেও অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়নি। "স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারও তার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়নি। বর্তমানে খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক (?) সরকারও অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দিবে বলে মনে হয় না। গোলাম আযম যদি কোন অপরাধ করেই থাকেন তাহলে গোটা বাংলাদেশের একটি থানাতেও তার নামে কোন মামলা দুরে থাক একটি জি, ডিও কেন করা হয়নি? যার বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই, নেই কোন সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

অভিযোগ, তাহলে কেন তার নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে না? গোলাম আযমের অপরাধ কি? তার অপরাধ তো মাত্র একটিই তিনি ইসলামের কথা শুধু মুখেই বলেন না, কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িতও করেন। তিনি আপোষ করতে জানেন না। যদি তিনি আপোষ করতেন তাহলে বহুপূর্বেই তিনি এদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব পর্যন্ত লাভ করতে পারতেন।

- গোলাম আযমকে এত ভয় কেন? প্রতিটি সরকারই গোলাম আযমকে এত ভয় কেন পান? বাতিল আদর্শের ফেরীওয়ালা রাজনৈতিক দলগুলি গোলাম আযম স্বাধীনতা বিরোধী, পাকিস্তানী নাগরিক বলে তারস্বরে চেঁচামেচি কেন করেন? গোলাম আযমের নাম শুনলেই এই বর্ণচোরা ঘাতকরা কেন আঁতকে উঠেন? এর কারণ কি?

এর কারণ হলো গোলাম আযমের মত মেধা সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান দুরদর্শী নেতা এদেশে নেই। জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারেন একমাত্র গোলাম আযমই। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গোলাম আযমের পায়ের ধুলোর কাছেও পৌছাতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ঘেও ঘেও করা হয়। শোষক গোষ্ঠী এদেশে জামায়াত শিবিরকেই তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করেন। আর গোলাম আযমের মত দক্ষ নেতা যদি ময়দানে নামতে পারে এবং জনগণের সামনে ইসলামকে পেশ করার সুযোগ পায় তাহলে ইসলামহীন দলগুলোর মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠবে। এই ভয়েই তারা ও তাদের মুরব্বী আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত ও বৃটেন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ডাষ্টবিনের হাড় চাটা কুকুরেরা গোলাম আযমকে জনগণের সামনে আসতে না দিয়ে ঘরের মধ্যে আটক রেখেছে। আজ গোটা জাতি জানতে চায়, কেন তাদের প্রাণ প্রিয় নেতাকে তাদের সামনে আসতে দেওয়া হচ্ছে না? এদেশের জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ মিছিল মিটিং ও পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে তাদের কণ্ঠস্বর অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে এসেছে। কোন সরকারই জনগণের দাবী পুরণ করে তাদের নেতার নাগরিকত্ব দেয়নি। জনগণের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেংগে যে কোন ধরনের মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার দায় দায়িত্ব বহন করবে কে?

সিংহকে খাঁচায় বন্দী করে বন্দী সিংহের প্রতি দাঁত মুখ খিচিয়ে ভেংচানো নেড়ী কুত্তার স্বভাব। বীরত্বে যদি কুলোয় তাহলে গোলাম আযমকে ময়দানে নামার সুযোগ দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিরা রাজনৈতিক প্রতিযোগীতায় আসুন, তাহলে

www.pathagar.com

প্রমাণ হবে রুশ ভারত আমেরিকা চীন ও বৃটেনের আদর্শের এ দেশীয় ফেরীওয়ালাদের শক্তি বেশী না ইসলামের মুজাহিদ নরশার্দুল গোলাম আযমের আদর্শের শক্তি বেশী।

গোলাম আযমকে ভয় করার একমাত্র কারণই হলো যে, তিনি এদেশকে জালিম মুক্ত শোষণমুক্ত দেখতে চান। তিনি দেখতে চান সুদ মুক্ত যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে তিনি প্রশান্তি দেখতে চান। তিনি দেখতে চান ছাত্র সমাজ দলীয় লেজুর বৃত্তি না করে জ্ঞান অর্জনের পথে নিজেদের সময় ব্যয় করছে। তিনি দেখতে চান নারী তার মর্যাদা ফিরে পেয়ে ইসলামের দেওয়া সম্মানের আসনে আসীন হয়েছে। তিনি দেখতে চান রাজনীতি কলুষমুক্ত হয়ে সৎ লোকগুলির রাজনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। গোলাম আযম রাজনীতিকে ব্যবসার গন্ডীর মধ্য থেকে বের করে জনগণের কল্যাণে রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি জাতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে চান। তিনি পরনির্ভরশীল অর্থনীতির মাথায় লাথি মেরে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়তে চান। তিনি নতজানু পররাষ্ট্রনীতির শৃংখল ছিন্ন করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি চালু করতে চান। তিনি অশ্লীল নগ্নতা বেহাইয়াপনা বন্ধ করে জাতিকে নৈতিক চরিত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্বের কাছে এ জাতিকে অনুকরণীয় করতে চান। তিনি জাতির মেধা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে দেশকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে গড়তে চান। তিনি সৃষ্টিগতভাবে সমস্ত মানুষকে সমান অধিকারী বলে মনে করেন। তিনি সাদা কালোর কোন ভেদাভেদ রাখতে চান না। গোলাম আযম কেবল মাত্র আল কোরান ও নবী (দঃ) এর সুন্নাহকেই মানব মুক্তির মহাসনদ বলে মনে করেন তিনি জাতীয় প্রচার মাধ্যমকে সত্যবাদী হিসেবে দেখতে চান।

এ সমস্ত কিছু চাওয়াটাই গোলাম আযমের বড় অপরাধ (?) তাই তার নাগরিকত্ব না দিয়ে বিএনপি সরকার ভারতের গুটি কতক দালালদের গোলাম আযম এবং তার দল জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। যার প্রমাণ ১৯৯২ ইং সনের স্বাধীনতা দিবসে ২৬শে মার্চের বুনো আদালত। ইসলাম ও দেশের শত্রুরা দেশে গৃহ যুদ্ধ শুরু করে এ দেশটাকে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্যে ঢাকার সোরওয়ার্দী উদ্যানে গণ আদালত নামের এক নাটক মঞ্চস্থ করে। আমেরিকা কর্তৃক নির্দেশিত ভারত কর্তৃক পরিবেশিত শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রযোজিত, জাহানারা ইমাম (জাহান্নামের ইমাম) কর্তৃক অভিনীত

www.pathagar.com

নাটকে গোলাম আযমের ফাঁসি দাবি করা হয়। এ গণ আদালত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আমদানী করে চরম পন্থী কমিউনিস্ট নকসাল বাড়ীর চারু মজুমদার ও কানু স্যান্যালেরা, তারা শ্রেণী শত্রু খতমের নামে রাতের আঁধারে তথাকথিত গণআদালত বসিয়ে প্রতিপক্ষকে হত্যার নির্দেশ দিত। স্বাধীনতার শত্রুরা জামায়াতে ইসলামীকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে তথাকথিত গণআদালত বসায়। এই গণআদালতে ১০/১৫ হাজার লোক টাকা দিয়ে ভাড়া করে এনে তাদের সামনে গোলাম আযমের ফাঁসীর রায় পড়ে শোনানো হয়।

দেশে যেখানে জর্জকোট হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট আছে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার আছে, আছে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ সেখানে গণআদালত বসানোর উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য একটাই, তাহলো শেখ মুজিব কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধীর সাথে পঁচিশ বছরের দাস চুক্তি অবসানের পূর্বে যাতে বাংলাদেশকে ভারত অংগ রাজ্যে পরিণত করতে পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা। ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারকে ভারত কাশিমবাজার কুঠিতে পরিণত করে সেখানে মুজিব তনয়া হাছিনাকে দিয়ে ঘসেটি বেগমের রোল করাচ্ছে। দেশের জনগণ দেখতে পাচ্ছে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের হত্যার সাথে যারা জড়িত ছিল তারাই "৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি" গঠন করে দেশব্যপী ইসলাম পন্থীদের উপরে হামলা চালাচ্ছে। আর জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থেকেও অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে ঐ নির্মূল কমিটির গণআদালতীদের তোয়াজ করে যাচ্ছেন। অথচ খালেদা জিয়া ইসলামের কথা বলেই জনগণের কাছ থেকে ভোট নিয়েছেন। বে-আইনী গণআদালতীরা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সম্মানিত খতিবকে যখন অশ্লীল ভাষায় গালি দিচ্ছে, যখন মসজিদ বন্ধ করে দেবার জন্য হুমকি দিচ্ছে, যখন রাস্তায় দাড়ি, টুপিওয়ালাদের উপরে হাত উঠাচ্ছে, মওলানা ছাঈদীসহ অন্যান্য আলেমদের অপমান করছে, যখন ইসলামপন্থীদের হত্যা করছে, আর এর প্রতিবাদে ইসলামপন্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করছে তখন খালেদা সরকার লজ্জাহীনভাবে প্রতিবাদ সমাবেশ স্থলে ১৪৪ ধারা জারী করে,"ইসলামের সৈনিকদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে শুধু তাই নয় ঐ চব্বিশজন গণআদালতীদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আদালতে থাকার পরও তাদেরকে গ্রেফতার না করে তাদের হীন ষড়যন্ত্রের সহযোগীতা করছে বর্তমান সরকার। আর যার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীর কোন থানায় কোন অভিযোগ নেই, সেই বিশ্ব বরেন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে চোরের মত রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে ঢাকা জেলে আটক করেছে খালেদা সরকার। যে কাজ করতে সাহস পায়নি তার স্বামী মরহুম জিয়াউর রহমান, সাহস পায়নি চরম স্বৈরাচার এরশাদ সরকার আর ১৯৯২—এর ২৭শে মার্চ মধ্যরাত্রিতে সেই কাজ করলেন খালেদা জিয়া

এদেশটাকে যারা ১৯৪৭ পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ ভারতভুক্ত করতে চেয়ে সেমিনারের আয়োজন করে বেগম খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণ করে উক্ত সেমিনারে নিয়ে তার সামনে দেশদ্রোহীতামূলক বক্তৃতা যখন দেয়া হয়, তখন শেখ হাসিনা ইন্দিরা গান্ধির দাসী হবার কারণে না হয় চুপ করে থাকলে থাকতে পারে কিন্তু, ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী জনতা যাকে দেশের সর্বময় ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়েছে সেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কি করে নীরবে শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে পারেন? খালেদা সরকার কিভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমকে "ষ্টেট লেস পারসন" বলতে পারেন? ইসলাম, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের উপরে আঘাত হানার জন্য কি এদেশের তৌহিদি জনতা বি, এন, পি-কে ক্ষমতা দিয়েছে? তথাকথিত গণআদালত নিয়ে সংসদে বসে এক কোটি টাকার উপর অপচয় করার অধিকার বেগম খালেদা জিয়াকে কে দিল?

গণআদালতীরা যখন দেশের সি, এম, এম কোর্টে হামলা চালাচ্ছে তখন বেগম খালেদা জিয়া কি কিছু উপলব্ধি করতে পারছেন না? আর শেখ হাসিনা যেখানে গণ আদালতের রায় বাস্তবায়নের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন, তাহলে তার বাবার হত্যাকান্ডের বিচার করার জন্য কেন তিনি গণ আদালত বসাচ্ছেন না? হাছিনা ভাল করেই জানেন এই গণ আদালত তার বিরুদ্ধেও বসতে পারে। স্পীকার শাহেদ আলীকে হাছিনার লোকেরা হত্যা করেছে। হাছিনার বাবার শাসন আমলে অসংখ্য মানুষ হত্যা করা হয়েছে। এ সমস্ত হত্যা কান্ডের জন্য হাসিনা ও তার দলের বিরুদ্ধেও গণআদালত বসতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গণআদালতের নামে দেশে যা হচ্ছে তা ইসলামকে ধ্বংস করে দিয়ে এদেশকে ভারতভুক্ত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

জামায়াতের বিরুদ্ধে না হয় ৭১—এর অভিযোগ থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু আলজেরিয়ার ইসলামিক স্যালভেসন ফ্রন্ট কি অপরাধ করেছে? জনগণতো তাদেরকে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের জন্য ভোট দিয়েছিল। সেই ইসলামী জনগণের বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়ে ইসলাম পন্থীদের কেন মৃত্যুদন্ড

www.pathagar.com

দেওয়া হচ্ছে? আসলে আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ফসল হচ্ছে বাংলাদেশের তথাকথিত গণ আদালত।

১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন যে ভাবে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রয় করে দিয়েছিল প্রায় ২০০ বছরের জন্য, ঘসেটি বেগম, রায় দুর্লভ, উর্মিচাঁদ ও মীর জাফরেরা তেমনি আজকের বাংলাদেশটাকে বিক্রির নিলাম ডাকা হয়েছে। ২৬-এ মার্চ সোহরাওয়ার্দী বাগানে এ যুগের ঘসেটি বেগম চরিত্রহীনা অসংখ্য পুরুষের শয্যাসংগীনি জাহান্নামের ইমামকে দিয়ে। আজ গোলাম আযমকে বলা হচ্ছে তিনি নাকি বিদেশী নাগরিক, পক্ষান্তরে গোলাম আযম যখন কেয়ার টেকার সরকার-এর ফরমূলা দিয়েছিলেন তখন তিনি কোন দেশি নাগরিক ছিলেন? যার দেওয়া ফরমুলা অনুযায়ী এরশাদ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হলো এবং সেই ফরমূলা অনুযায়ী দেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

শেখ হাছিনাও বেগম খালেদা জিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থীরা যখন গোলাম আযমের কাছে ভোট ভিক্ষা করতে এলেন তাদের নেত্রীর নির্দেশে তখন গোলাম আযম কোন দেশী নাগরিক ছিলেন? এ সমস্ত প্রশ্ন আজ জাতির জিজ্ঞাসা তথাকথিত নেতা-নেত্রীদের কাছে। অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারাগারে বন্দী করা হয়নি, বন্দী করা হয়েছে এদেশের তৌহিদী জনতার ইসলামী চেতনাকে। কারণ গোলাম আযম ইসলামী চেতনার প্রতীক। এদেশের তৌহিদী জনতার কলিজা গোলাম আযমকে বেগম খালেদা জিয়া ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে বন্দী করে ভারতের উচ্ছিষ্ট ভোগী সি আর দত্ত গংদের জন্য ময়দান খালী করে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে সরকার যে খেলা খেলছেন তার ফল তাদের জন্যে শুভ হবে না ইনশাল্লাহ।

দেশের অসংখ্য সমস্যা যাদের দৃষ্টিতে কোন সমস্যা নয়, ফারাক্কার বাঁধের কারণে দেশ আজ মরুভূমিতে পরিণত, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস, চট্টগ্রামে তথাকথিত শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাস, রোহিঙ্গা সমস্যা, বেকার সমস্যাসহ অসংখ্য সমস্যার আবর্তে জাতি যখন খাবি খাচ্ছে তখন যারা বলছে গোলাম আযম দেশের ১ নম্বর সমস্যা তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত খারাপ তা জাতিকে আজকে উপলব্ধি করতে হবে এবং ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিছিল করে কারাগার ভেঙ্গে ইসলামের বীর সেনানী তৌহিদী জনতার নয়ন মনি মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে বের করে এনে এদেশে ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে হবে।

www.pathagar.com

প্রচার মাধ্যম বিভ্রান্তির কেন্দ্র বিন্দু

বর্তমান ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে ইসলামের শত্রুরা স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষের ধোয়া তুলে গোটা জাতিকে এক অনিশ্চয়তার মুখে, গৃহযুদ্ধের মুখে সিভিল ওয়ারে নিক্ষেপ করে এদেশে ভারতের সৈন্য আমদানী করতে চায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সব ব্যক্তির একই মতের অনুসারী হতে হবে এমন কথা গণতন্ত্র সম্মত বা যুক্তি সম্মত হতে পারে না। রাজনৈতিক বিরোধীতা ও দেশদ্রোহীতা এক কথা নয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যারা একমত হতে পারেননি তাদের অনেকেই পকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দেশ সেবা করেছেন এমনকি পাকিস্তানী মন্ত্রী সভাতেও স্থান পেয়েছেন, তার প্রমাণ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে থেকেও ফজলুল হক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরে তার দেশপ্রেমের কারণে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার তাকে প্রথমে গোটা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট মন্ত্রী নিযুক্ত করে এবং পরে তাবে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরও বানায়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি বংগদেশকে ভাগ না করে বাংলাদেশ ও আজকের কোলকাতা সহ আসামকে নিয়ে "গ্রেটার বেঙ্গল" গড়ার জন্যে শরৎবসুর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের লোক। তার প্রচেষ্টা সফল হলে পূর্ব বংগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো না। পরে যখন পূর্ব বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেল তখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার তাকে পাকিস্তানের শত্রু বলে ঘোষণা দিয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। পরে আবার তার দেশপ্রেমের কারণেই তাকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীত্ব দেওয়া হয়। তখন যদি স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষের প্রশ্ন তোলা হতো তাহলে এদেশ তাদের মত মহান দেশ সেবকের কাছে থেকে দেশসেবা লাভ করতে পারতো না।

ইসলামের শত্রুরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম জাতির মস্তক ধোলাই করার জন্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যম ও শিক্ষকদের মধ্যে তারা আসন গেড়ে বসে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, তরুণ তরুণীদেরকে ইসলাম ও

www.pathagar.com

ইসলামপন্থীদেরকে জাতির শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু, প্রগতির বিরোধী বলে প্রচার চালাচ্ছে। রুশ–ভারত, আমেরিকা চীন ও বৃটেন থেকে মস্তকধোলাই করে আসা শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র–ছাত্রীদেরকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দিচ্ছে। ইসলামপন্থীদেরকে ঘৃণা করা শিখাচ্ছে এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, পত্র–পত্রিকাতে মানবতা বিধ্বংসী মতবাদ মতাদর্শের গুণ কীর্তন করে প্রবন্ধ লিখছে। স্বনামে বেনামে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য প্রকাশ করে গোটা জাতিকে চরিত্র হননের পথে অগ্রসর করাচ্ছে।

ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা পত্রিকাগুলির একমাত্র দায়িত্বই যেন ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে লেখালিখি করা। রেডিও, টি,ভি চলে এদেশের মানুষের টাকা দিয়ে। আর এদেশের সংখ্যগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। রেডিও টি,ভি যে সমস্ত অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত করে তার অধিকাংশ জুড়ে থাকে ইসলাম ও ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধে যাতে ঘৃণার সৃষ্টি হয় এমন ধরনের বিষয়। প্রায় প্রতিটি নাটকেই মূর্তিপুজারী রবি ঠাকুরকে হিরো বানানো হয় এবং নাটকের ভিলেনের মুখে দাঁড়ী, মাথায় টুপি, গায়ে পাঞ্জাবী দিয়ে যাবতীয় অপকর্ম করিয়ে জাতিকে এটাই শিখানো হয় যে, টুপি দাড়ী তথা ইসলামপন্থীরাই হলো শয়তানের চেলা। নাটকগুলিতে রেজাকার আলবদরের প্রসঙ্গ অহেতুক টেনে এনে জাতিকে বিভক্ত করে দেশকে অবনতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। প্রচার মাধ্যমে মিথ্যা কাহিনীর প্রচার করে মানুষকে বিভক্ত করা হচ্ছে। যুবতী মেয়েদের প্রায় উলঙ্গ করে সিনেমা টিভির পর্দায় এনে তাদেরকে দিয়ে অশ্লীল অঙ্গভংগী প্রদর্শন করিয়ে কোমলমতি তরুণ তরুণীদের মধ্যে অপরিণত বয়সেই যৌন অনুভূতি জাগিয়ে দেশে ধর্ষণের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করা হচ্ছে। নারীকে পণ্য দ্রব্যের লেবেলে পরিণত করে প্রতিটি বিজ্ঞাপনে তাদের যৌবনকে পুঁজি করে বিজ্ঞাপন প্রচার করে নারীর মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। নাটক সিনেমাতে নায়ক নায়িকাকে দিয়ে মাজার স্পর্শ করিয়ে "আমরা কোন দিন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবো না" এমন শপথ করানো হচ্ছে যাতে করে মানুষ ইসলামী আন্দোলনে না এসে মাজার পূজারী হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে দেশে অসংখ্য পত্র–পত্রিকা প্রতিদিন ব্যাঙের ছাতার মত গজাচ্ছে। যে দেশে মানুষ এক মুঠো ভাতের পয়সা যোগাড় করতে হিমশীম খায়, সেই দেশে এত পত্রিকার গ্রাহক না থাকাই স্বাভাবিক আর

www.pathagar.com

গ্রাহক না থাকলে পত্রিকা প্রকাশের প্রশ্নই আসে না। গ্রাহক নেই, ক্রেতা নেই তবুও পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে। পত্রিকা বিক্রি হচ্ছে না, পরে সের দরে ঠোঙা বানানোর জন্যে বিক্রি হয়। প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তার আর্থিক ক্ষতি হয় না। কারণ পত্রিকা প্রকাশের খরচ প্রকাশককে বহন করতে হয় না। পত্রিকা প্রকাশের খরচ বহন করে এদেশে অবস্থিত অমুসলিম দেশের দূতাবাস বিভিন্ন ধরনের এন, জি, ও (নন গভর্ণমেন্ট অরগানাইজেশন) গুলি। যারা মানব সেবার আড়ালে মানুষদেরকে তথাকথিত যীশু খৃষ্টের ভ্রান্ত মতবাদ শিক্ষা দিয়ে সহজ সরল মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান বানাচ্ছে। অমুসলিম দূতাবাসগুলি ইসলামী আন্দোলকে ধ্বংস করে দেবার আখড়া। এরা বর্ণচোরা মুসলমানদের হাত করে এদের দ্বারায় পত্রিকা প্রকাশ করে সেই পত্রিকার মাধ্যমে তাদের বস্তাপচা আদর্শ ফেরী করাচ্ছে। স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষের প্রশ্ন তুলে জাতিকে বিভক্ত করছে। মুসলিম বীরদের ইতিহাস বিকৃত করছে। নগ্ন ছবি ছাপিয়ে জাতির আগামী দিনের কর্ণধার তরুণ যুবকদের চরিত্রহীন করে গড়ে তুলছে। ৭১–এর সাঁজানো কাহিনী প্রকাশ করে দেশপ্রেমিক নেতাদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। ইসলামের মিছিল বা সমাবেশের কোন ছবিই এরা ছাপাতে চায় না। নিরপেক্ষতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যদিও ইসলামী মাহফিলের ছবি এরা ছাপে তাহলে এত ছোট করে ছাপে যে খুজে পেতে হলে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র লাগে। জামায়াত শিবিরকে মানুষদের কাছে ঘৃণার পাত্র করার জন্যে অন্য দলের উপরে জামায়াত শিবির কর্তৃক কল্পিত আক্রমণের সংবাদ প্রচার করে মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের পথ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশের যে সব স্থানে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত শিবির তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সংখ্যায় বেশী সে সব স্থানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের কল্পিত মিথ্যা বানোয়াট খবর পত্রিকায় প্রকাশ করে সরল প্রাণ সাধারণ মানুষদেকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ইসলাম বিরোধী অন্য দল কর্তৃক জামায়াত শিবির আক্রান্ত হলে বা ইসলামী আন্দোলনের কোনকর্মী আহত নিহত হলে সে সংবাদ এই সমস্ত পত্রিকাগুলি প্রকাশ করে না। সুতরাং এদেশের অধিকাংশ পত্রপত্রিকা ও চলচ্চিত্র জগৎ এবং রেডিও টি, ভি মিথ্যা প্রচারের ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী।

www.pathagar.com

শিরকের শ্লোগান

যারা মুসলমান, কোরআন তাদেরকে আল্লাহর সৈনিক (হেযবুল্লাহ) বলে ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যারা সংগ্রাম করে তথা ইসলামী আন্দোলন করে তারাই কেবল মাত্র আল্লাহর সৈনিক। আর যারা মানুষের তৈরী করা মতবাদ মতাদর্শ তথা শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত আদর্শ যেমন সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সমাজতন্ত্র, সংকীর্ণ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে কোরআন এদেরকে শয়তানের দল বা শয়তানের সৈনিক (হেযবুশ শয়তান) বলে ঘোষণা দিয়েছে। কোন মুসলমান নবী (দঃ) কে বাদ দিয়ে "আমরা তোমার নেতা অমুক" এই জাতীয় শ্লোগান দিতে পারে না। এ জন্যে আমরা দেখি জামায়াত শিবির ময়দানে শ্লোগান দেয় "আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্ব নবী মোস্থফা (দঃ)"। আর যারা অন্য কোন নেতা নেত্রীর সৈনিক সেজে "আমরা সবাই অমুকের সেনা, নেতা–নেত্রী মোদের অমুক" ইত্যাদি শ্লোগান দেয় তারা প্রকারন্তরে আল্লাহর কাছে ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ শিরক্ করে। আল্লাহর কোরআন বলেছে শিরককারীর জন্য আল্লাহর বেহেস্ত হারাম।

ইতিহাসের আলোকে এদেশবাসীর কর্তব্য

ইতিহাসের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বার বার এদেশের মুসলিম জাতিকে তার গায়েবী মদদ দিয়ে হেফাযত করেছেন। আল্লাহর রহমতে এদেশের মানুষদের মধ্যে এমন কিছু দল বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং এমন কিছু নেক বান্দা এই জমিনের উপরে আল্লাহর রহমতের দুয়ারে কাকুতি মিনতি জানাচ্ছে, এমন কিছু আল্লাহর প্রিয় বান্দা এই মাটিতে ঘুমিয়ে আছে যাদের পূণ্যতৎপরতার কারণে এদেশটি শত্রু দেশের পদানত হয়েও হয়নি। ১৯৭১ সনে এদেশের অবস্থা ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছিয়েছিল যে, অবস্থা আর সামান্য একটু ব্যতিক্রম হলেই নয় শত বছর দূরে থাক নয় যুগেও স্বাধীন হতো কিনা সন্দেহ ছিল। এদেশের মুসলমানদের কিভাবে আল্লাহ হেফাযত করেছেন তার নমুনা দেখুন। জাতীয় দলের প্রধান মরহুমা আমেনা বেগম যিনি এক সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী ছিলেন তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "রাজনাতি ছিল শেখ মুজিবের ব্যবসা। আমার কাছে প্রমাণ আছে যে, ১৯৭৫–এর ১৫ই আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চারটি হেলিকপ্টারে করে চারজন ভারতীয়

www.pathagar.com

জেনারেল দশ হাজার ভারতীয় পতাকা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিল শেখ মুজিবকে দিল্লীতে নিয়ে যাবার জন্যে। ভারতের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে নব্য অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের আমরণ মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেওয়া"। পক্ষান্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদেশের সেনাবাহিনীর নিচের স্তরের এমন কিছু অফিসারদের এমন যোগ্যতা দান করলেন যে, মুজিব আভা বাচ্চাসহ সিগারেট এর পাইপ হাতে সিড়ির নিচে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হলো। অবস্থা এমন হলো, "এক নেতা এক দেশ, এক রাত্রিতে সব শেষ"। ৭১ পূর্ব অবস্থায় যার ডাকে কোটি কোটি মানুষ জীবন দেওয়ার জন্যে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যেত আর ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টে স্ববংশে তার মৃত্যুতে রাস্তায় একটি কুকুরকেও আফসোস করতে দেখা যায়নি।

ভারতের পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলো এদেশের মুসলমানদের অবস্থা কোন স্তরে গিয়ে দাঁড়াতো ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে। ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানী জৈল সিং তার বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন যে, "ভারতের পক্ষে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা ঠিক হয়নি" মহান আল্লাহ মুসলমানদের হেফাজতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন করে দেন যে, যার ফলে ভারত এদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭১ সনে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্যে আমেরিকার সপ্তম নৌ–বহর যখন বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন অবস্থা বিপদজনক দেখে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাত্র তিন দিনের সফরে ভারত এসে বেশ কিছু দিন থেকে গেলেন। আর ভারত শুধু রেডিও মারফত পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহবান জানাতে থাকে। রাশিয়া চিন্তা করলো আমেরিকা যদি একটি মিসাইল ভারতের দিকে ছুড়েই তাহলে ভারতের পিরিতের খাতিরে আমেরিকার মিসাইলের জবাব আমাদেরকেই দিতে হবে। অথচ সরাসরি আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করার যোগ্যতা রাশিয়ার নেই। অবস্থা খারাপ দেখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল ভেংগে যায় তাই বার বার শুধু বলা হচ্ছিল পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে। এদিকে পাকিস্তান সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি করে সরাসরি জাতিসংঘে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে দেয়। পাকিস্তান সরকার সময়মত আত্মসমর্পণ না করলে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে দুই পরাশক্তির মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা ছিল। যদি যুদ্ধ লেগেই যেত তাহলে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অবস্থা শুধু পোড়া ছাই এর আকার ধারণ করতো। আত্মসমর্পণের পরে বাংলাদেশে যে হারে ইসলামপন্থীদের হত্যা করা হচ্ছিল তাতে করে এদেশের সাধারণ মুসলিমরা ইসলামী চিন্তা চেতনাহীন হয়ে পড়তো। আমি অনেক আর্মি অফিসারদের মুখে শুনেছি তারা এদেশের প্রখ্যাত আলেম ওয়ালামাদের রুশ-ভারত পন্থীদের হাত থেকে হেফাজত করার জন্যে নিজে গাড়ী চালিয়ে আলেম ওলামাদের নিরাপদ স্থানে রেখে এসেছেন। এমন অফিসারদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর জয়নুল আবেদীন খাঁন ও এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবও ছিলেন।

অপরদিকে ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের জেলে যাবার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়ে তাদেরকে হেফাজত করলেন। যার ফলে জেলে বন্দী ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের প্রচেষ্টার কারণেই বাংলাদেশের বুকে ইসলামের বিজয় কেতন উড়তে শুরু করেছে। প্রায় লক্ষাধিক পাকিস্তানী সৈন্য যখন ভারতের হাতে বন্দী হলো তখন আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ভারত পাকিস্তানী সৈন্যেদের স্বদেশ পাঠাতে বাধ্য হলো। ১৯৭৫-এ ১৫ই আগষ্ট যা ঘটলো, ৭ই নভেম্বর যা ঘটলো এসবই ছিল এদেশের মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে আল্লাহর রহমত। ১৯৬৫ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর এ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধেও আল্লাহ তার রহমত দিয়েই মুসলমানদের রক্ষা করে ছিলেন। পাকিস্তানের বৈমানিক আজিজ ভাট্টি তার নিজের লিখা যুদ্ধকালীন অবস্থা তুলে ধরেছেন এই ভাবে, "আমি ফজরের নামাজ আদায় করে কোরআন তেলাওয়াতের পরে ছোট এক জেল কোরআন শরিফ গলায় ঝুলিয়ে আক্রমণ করার জন্যে বিমান নিয়ে আকাশে উড়লাম। মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশ, ভারতের বিমান আমার বিমানকে লক্ষ্য করে যখনই গুলি ছোড়ার চেষ্টা করছে তখনই কোথায় থেকে এক খন্ড মেঘ এসে আমার বিমানকে আড়াল করে ফেলেছে। পরিশেষে শত্রুপক্ষই পরাজিত হলো। আমি কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করলাম।"

এভাবে আল্লাহ বার বার মুসলমানদের হেফাজত করেছেন। আজিজ ভাট্টির লিখা পড়ে আমার মনে পড়লো বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর আল্লামা ইকবালের কবিতা,

অজ্‌ভি গ্যড়হো ইবরাহিমকা ইমান প্যঁয়দা
আগ্ কার ছ্যক্‌তি হ্যায় আন্দাজ এ্যকগুলিস্তা প্যয়দা

www.pathagar.com

ফাজায়ে ব্যদর কুন, ফেরেশতে তেরি নুসর্য়ত কি
উতার কার গাঁর দুঁছে কাতার আন্দার কাতার রাব্বি।

"এখনো যদি ইবরাহিম (আঃ) এর মত ইমান যদি বা নাতে পারো, তাহলে অগ্নিকুন্ড বর্তমানেও ফুলের বাগানে পরিণত হবে। ঐ আল্লাহ এখনো যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবেন, যদি তোমরা ইমানের সাথে কাতার বন্দী হয়ে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করতে দাড়িয়ে যাও।"

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ৭১–এ পরাজিত হবার অন্যতম কারণ ছিল তারা ইমান হারিয়ে ইসলামের সীমা লংঘন করে আল্লাহর গজবে পড়ার উপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলিম সেনাবাহিনী যদি আল্লাহর উপর দৃঢ় ইমান রেখে ইসলামের রঙে রঙিন হয়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে বাহিনী কখনো পরাজিত হবে না।

"ট্যলনা ছ্যাক্তে থেঁ আগাড় জ্যাং মে আড়
যাতে থেঁ
পাঁও ছেরে খা ভি ম্যায়দান ছে
উখড় যা তে থেঁ"
"বাতিলছে দাবনে ওয়ালে আঁয় আছমা
নেহি হ্যায় হাম্
ছাওবার কার চুকা হ্যায় তু ইমতেহ্যান
হামারা।"
"তেগো কি ছায়ে মে হাম পাল্ক্যার
জোঁয়ান হুঁয়ে হেঁ"।

"যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনী আমাদের কুজকাওয়াজ করতে দেখেই শৃগালের মত ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। মিথ্যা শক্তির কাছে আমরা মুসলিমরা কখনো যে মাথা নত করিনি, হে খোদা তুমি অনেক বার তা পরীক্ষা করে দেখেছ। তরবারীর ছায়াতলে আমরা লালিত পালিত হয়ে যৌবনে পা দিয়েছি।"

অস্ত্র যতই অত্যাধুনিক হোক না কেন তা দিয়ে কখনো যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, যদি না অস্ত্রের পিছনের মানুষটির মন মানসিকতা ভয় শূন্য না হয়। একজন যোদ্ধা তখনই মন–প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করবে যখন তার মধ্যে এ অনুভূতি আসবে যে, আমার দায়িত্ব পালনে শিথিলতার কারণে এদেশ যদি পরাধীন হয়ে

www.pathagar.com

যায় তাহলে আল্লাহর ইসলাম আর স্বাধীন পরিবেশে থাকতে পারবে না। কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর দরবারে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

সুতরাং ইতিহাসের আলোকে বিচার করে দেখতে হবে কে আমাদের বন্ধু আর কে আমাদের শত্রু। এ দেশের মানুষ যদি তাদের শত্রু-মিত্র চিন্তাতে ব্যর্থ হয় তাহলে অন্য জাতির গোলামী করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। দিল্লী, পিকিং , মস্কো, ওয়াশিংটন লন্ডনে বৃষ্টি পড়লে যারা ঢাকায় ছাতা মেলে দেয়, যারা এদেশে আফগান স্টাইলে বিপ্লবের হুমকি দেয়, যারা ভারতীয় উৎপাতের মুখে নিরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করে তারা কখনো এদেশের স্বাধীনতার হেফাযতকারী হতে পারে না, যারা কোন মানুষের তৈরী আদর্শ এদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করে তারাও প্রকৃত দেশ প্রেমিক নয় এবং দেশের স্বাধীনতা তাদের দ্বারা নিরাপদ নয়।

এদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এদেশের উপরে হামলা যদি আসে তাহলে যাদের আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন দেশ এই বাংলাদেশের পাশে নাই তারাই প্রকৃত দেশ প্রেমিক, এ দেশে ইসলামী বিপ্লব ঘটুক এটা ভারতসহ ইসলাম বিরোধী কোন দেশই চায় না। সুতরাং ইসলাম পন্থীদের ঐ সমস্ত দেশ কর্তৃক সাহায্য করার কোন প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং ইসলাম পন্থিরা নিজেদের গরজে বা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে প্রাণ দিয়ে হলেও এদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে। ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণিত সত্য যে, ভারত কোন দিনই এদেশের বন্ধু নয়। ৭১-এ বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে ভারত যে সাহায্য করেছিল তা তাদের স্বার্থের কারণেই। সুতরাং ইসলাম পন্থিরা ছাড়া এদেশকে রক্ষা করবে এমন শক্তি এদেশে নেই। এদেশে আওয়ামী লীগসহ এমন কিছু দল আছে যারা এদেশে ভারতীয় সৈন্যকে কদমবুছি করে স্বাগত জানাবে। আওয়ামীলীগ নেতা আঃ রাজ্জাক সাহেব তো একবার ইসলাম পন্থিদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেই ছিলেন, "তোমরা বেশী বাড়াবাড়ি করো না, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর তিন দিক দিয়ে তোমাদের ঘিরে রাখা হয়েছে, তোমরা কোথায় যাবে?" সুতরাং সেনাবাহিনী যদি পরিপূর্ণ ইসলাম পন্থি না হয় তাহলে কোন আদর্শ রক্ষার জন্যে জান-বাজী রেখে তারা যুদ্ধ করবে? সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতার প্রমাণ দিলে পৃথিবীর আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু আল্লাহর কাছে ফাঁকি

www.pathagar.com

দেওয়া যায় কি? আল্লাহর ভয়ই কেবলমাত্র সৈনিকদের মনোবল দক্ষতা বৃদ্ধি করবে– রেডিও'তে দুর্বার অনুষ্ঠান শুনে আর শিখা অনির্বাণে অগ্নি উপাসকদের কায়দায় নমস্কার দিয়ে নয়।

ইসলামী আদর্শ বিহীন দলগুলি যতই দেশ প্রেমের কথা মুখে বলুক না কেন, এরা সুযোগ পেলেই এদেশকে অন্য দেশের গোলামে পরিণত করবে। এদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি যারা ক্ষমতা হাতে পেয়েছে এবং ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছে, তারা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিমদের আশা–আকাংখা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পদ–দলিত করেছে। ইলেকশনের সময় ঘনিয়ে এলেই "বিসমিল্লাহির" নাম ভাঙ্গিয়ে, ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে ভোট নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে "আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিছমিল্লাহ" বলে দেশে মদের লাইসেন্স দিয়েছে। বিসমিল্লাহ বলে তারা নারীদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা না করে নারীর ইজ্জত বিক্রির পতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়েছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে তারা যুবকদের ব্যবহার করেছে, নারী স্বাধীনতা ও খালকাটার নামে মহিলাদের ঘর থেকে টেনে বের করে গোটা দেশে ব্যাভিচারের সয়লাব বইয়ে দিয়েছে, অনুৎপাদনশীল খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে। মুখে বিসমিল্লাহ বলে গোটা দেশে অশ্লিল সাহিত্য পত্র পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে যুব–তরুণীদের চরিত্র ধ্বংসের যাবতীয় ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে। এই বিছমিল্লাহর সাইন বোর্ডধারী গোষ্ঠি জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ইসলাম উৎখাতের যাবতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত দুই একটি দল তো পুনরায় ক্ষমতা হাতে পেলে মুসলমানদের এই পবিত্র ভূমিকে সরাসরি হিন্দু ভারতের অঙ্গরাজ্যেই বানিয়ে ছাড়বে। ১৭৫৭ সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশের ইতিহাস জেনে এবং ১৯৪৭ সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত দল ও গোষ্ঠি এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে তাদের অতীত বর্তমান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়ে এদেশবাসীর সামনে যে কর্তব্য এসে উপস্থিত হয়, তাহলো ১৯৪৭ সন থেকে চলমান সময় পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী কোন দল বা গোষ্ঠী এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। তাই অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে হলেও ইসলাম পন্থীদের একবার ক্ষমতায় পাঠানো এদেশবাসীর জন্যে একান্ত

www.pathagar.com

কর্তব্য। ইসলামী যে দল ইলেকশনের পূর্বেও ইসলাম মেনে চলে এবং ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকে এবং ইলেকশনের পর ভোট পেলে বা না পেলেও ইসলাম মেনে চলে এবং মানুষকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়, তাদেরকে ক্ষমতায় পাঠানো এদেশবাসীর জন্যে ফরজ।

ভোট একটি আমানত। এ আমানতের খেয়ানত করলে আল্লাহর গজবে মানুষ পড়তে বাধ্য, যার বর্তমান প্রমাণ, দেশে ঘুর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, মহামারী, দুর্ভিক্ষ একটার পর একটা আল্লাহর গযব আসছে। গোটা দেশে ইসলাম পন্থিদের ভোটে বিজয়ী না করে বিসমিল্লাহর নামে যারা ভন্ডামী করে তাদের এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীনদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করার কুফল হিসাবে দেশে মারাত্মক অরাজকতা নেমে এসেছে কি–না তা চিন্তা করে দেখা এদেশবাসীর একান্ত কর্তব্য। আল্লাহর নবী (দঃ) এর কথা অনুযায়ী, তসবিহ ছিড়ে গেলে তসবিহ–এর দানা যেমন একটার পর একটা পড়তে থাকে ঠিক তেমনি আল্লাহর গযব একটার পর একটা আসতে থাকবে যখন মুসলমানরা ইসলাম ছেড়ে দূরে চলে যাবে।

যাদের ভোটে বিজয়ী প্রার্থী ক্ষমতা হাতে পেয়ে যদি কোন পাপ কাজ করে তাহলে পাপের অংশিদার তাদের সবাইকে হতে হবে যারা ঐ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান, এম,পি বানিয়েছে। আর বিজয়ী প্রার্থী যদি কোন ছওয়াবের কাজ করে তাহলে ঐ ছওয়াবের অংশীদার ভোটদাতাদেরও হবে। আর কোন মুসলমানের জন্যে এ অধিকার ইসলামে দেয়নি যে, ইসলামী আদর্শহীন কোন ব্যক্তিকে সে ভোট দিতে পারবে। ভোট প্রার্থী ব্যক্তি যতই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হোক আর যত বড় রাজনীতিবিদ বা সমাজসেবক হোক না কেন। মুসলমান এবং ইসলামের স্বার্থ যার দ্বারা সংরক্ষিত হবে না, তাকে ভোট দেওয়া কিছুতেই মুসলমানদের জন্যে উচিত নয়।

কোন নির্বাচনী এলাকায় যদি ইসলামী সংগঠনের প্রার্থী না থাকে তাহলে মুসলমানদের ইসলামী দৃষ্টিভংগী নিয়ে ভোট দেওয়া উচিত।

সুতরাং ভৌগলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম দেশ, এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা হেফাজত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের অস্থিত্ব রক্ষা করার জন্যে ইসলাম বিরোধী শক্তির রাজাকার, আল–বদর, আস্‌সামস্‌, প্রতিক্রিয়াশীল,

www.pathagar.com

মৌলবাদী, সাম্প্রদায়ীক গালাগালী শুনে ইসলাম পন্থীদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয়ে ইসলামী দলকে ক্ষমতায় পাঠানো একান্ত কর্তব্য। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত জামায়াতে ইসলামীকে বা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ক্ষমতায় না পাঠালে এদেশের অবস্থা স্পেন, আফগানিস্থান, লেবানন, ফিলিস্তিন ও উগান্ডা–নাইজেরিয়ার মত হতে বাধ্য।

ইসলাম ও ধর্ম নিরপেক্ষতার দ্বন্দ্ব

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এবং ইসলামের সাথে এর কি সম্পর্ক? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এই মতবাদের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। কেন এই মতবাদের উদ্ভব ঘটলো এই পৃথিবীতে, কখন কিভাবে ঘটলো? কোথায় এর জন্মস্থান? কারা এর জন্মদাতা? কি প্রয়োজন ছিল এই মতবাদের? কোন শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান গোটা পৃথিবীতে এর বিকাশ সাধন ঘটলো? এই মতবাদ মানব জাতির জন্য কতটা কল্যাণকর? যারা এই মতবাদ গ্রহণ করেছে তাদের বর্তমান অবস্থাই বা কি? ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা বর্তমান পৃথিবীতে অত্যন্ত কৌশলের সাথে এই ধর্মনিরপেক্ষ নামক অস্ত্র দিয়ে ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। অথচ সাধারণ মানুষকে বুঝানো হচ্ছে এই মতবাদের অর্থ হল, যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। ইসলামের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। ইংরেজী "সেকিউলারিজম" শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, এই সেকিউলারিজম শব্দের প্রকৃত অর্থ হল' ইহ জাগতিকতা'। যার ব্যখ্যা করলে আমরা বুঝতে পারি এই জড় জগতে যা কিছু আছে কেবল সে সবকেই এই মতবাদ স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই জড় জগতের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার না করার নামই ইহ জাগতিকতা। অতিন্দ্রিয় কোন শক্তিকে স্বীকৃতি না দেওয়ার নামই হচ্ছে ইহজাগতিকতা। অর্থাৎ সেকিউলারিজম অনুযায়ী যা কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া যাবে আর যা কিছু ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। এই মতবাদ সরাসরি ধর্মের উপর আঘাত হানে না, অথচ ধর্মের মূল কেটে দেয়। বিগত পৌনে তিনশত বৎসর ধরে এই মতবাদ গোটা পৃথিবীতে একটি আদর্শ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে আসছে। মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে তুরস্কের কামাল পাশাই সর্বপ্রথম এই মতবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বে কোন মুসলিম দেশ এইভাবে বিশ্বব্যাপি ঘোষণা দিয়ে

www.pathagar.com

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের নির্লজ্জ পূজারী সেজেছেন বলে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট ইসলামের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটেছিল সে রাষ্ট্রেও এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের ঘৃনিত ষড়যন্ত্রের কারণে, ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর অগণিত মুসিলম নর নারীর তপ্ত রক্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল। পাকিস্তানের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের কলঙ্কময় ইতিহাস। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের কারণেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চরম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পক্ষান্তরে দুঃখজনক হলেও এ কথা ধ্রুব সত্য যে, ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের দিন থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ কুচক্রী মহলের অনুরূপ ষড়যন্ত্রেই এই সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা সোনার বাংলাদেশ, আসমুদ্র হিমাচল রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাষী আধিপত্যবাদী পরাশক্তি ও আগ্রাসী চানক্যবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ মানুষের ব্যক্তি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ। ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ সব ধরনের নীতিমালা হতে হবে ধর্মের প্রভাব মুক্ত। সংগত কারণেই এই মতবাদকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ না বলে, ধর্মহীন মতবাদ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মানুষ ব্যক্তিজীবনে ইচ্ছা করলে ধর্মকে পালন করতেও পারে অথবা ধর্মীয় নীতিমালা পরিহারও করতে পারে।

এই স্বাধীনতাটুকু এই মতবাদ দেয় বলে এর নাম রাখা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মতবাদের জন্মদাতা ও ধারক বাহকেরা বলে থাকেন, ধর্ম মানুষের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। কে ধর্ম পালন করলো আর কে পালন করলো না, এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই মতবাদ সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্ব

www.pathagar.com

অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে এই মতবাদ নিজস্ব ধারণা মানুষের সামনে পেশ করে। আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে সসীম করতে চায়। আল্লাহ যতই বলুক না কেন যে, আমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আমি মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত এক কথায় মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে, মৃত্যুর পরে পর্যন্ত যত নীতিমালার প্রয়োজন, সব কিছু স্পষ্টভাবে আমি আমার নবীর মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সব কিছু চলবে আমার বিধিমালা অনুযায়ী। সার্বভৌমত্বের অধিকারী করে কোন মানুষকে আমি পৃথিবীতে পাঠাইনি। সার্বভৌমত্ব তথা আইন দেওয়ার অধিকার আমার। এভাবে আল্লাহ যতই ঘোষণা দেন না কেন, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বলে, না! তুমি আল্লাহ যদি থেকেই থাক তাহলে তোমার জায়গায় তুমি নিরবে বসে থাক। মানুষের জীবন চলার পথে তুমি হস্তক্ষেপ করতে এসো না। তুমি সার্বভৌমত্বের অধিকারী শুধু-নও, মানুষও সার্বভৌমত্বের অধিকারী (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ যখন বলেন মানুষ সৃষ্টি করেছি আমি সুতরাং মানুষ আমার দেওয়া আইন অনুযায়ী চলতে বাধ্য। তখন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বলে, না! তুমি মানুষ সৃষ্টি করলে করতেও পার কিন্তু, মানুষ তোমার আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়। তোমার আইন মেনে চলা না চলা মানুষের ইচ্ছাধীন। আল্লাহ যখন বলেন, "মানুষ আমার প্রতিনিধি" এই পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য হল জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার প্রতিনিধি করে চলা। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তখনই তারস্বরে চিৎকার করে উঠে, না! মানুষ কারো প্রতিনিধি নয়, মানুষ স্বয়ং সম্পূর্ণ। মানুষ সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ নিজেরাই আইন কানুন রচনা করতে পারে। এরা নিজেদের তৈরী আইন ছাড়া অন্য কোন আইনের মুখাপেক্ষী নয়। কোন খোদায়ী আইন বা অতিন্দ্রীয় শক্তির কাছে থেকে কোন আইন মানুষের জন্য আসার প্রয়োজন নেই। এভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করে। ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ দুনিয়ার জীবনে মানুষের উন্নতি, শান্তি, প্রগতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে কোন বিধান পাঠানোর প্রয়োজন নেই বলে ধারণা দেয়। সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্ম হস্তক্ষেপ করবে এ কথা যারা বলে, তারা প্রগতি বিরোধী। তারাই প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তি।

www.pathagar.com

দুই ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব থাকা চলবে না। সংক্ষেপে এটাই ধর্ম নিরপেক্ষতার স্বরূপ।

ধর্ম নিরপেক্ষতার গোড়ার কথা

ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সৃষ্টি হয়নি। যদিও বর্তমান পৃথিবীতে এই মতবাদটি বিশেষ একটি নামে দুনিয়া ব্যাপি আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে। ধর্ম নিরপেক্ষতা সৃষ্টি হয়েছে হাজার হাজার বছর পূর্বে। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের আধুনিক সংস্করণ জন্মলাভ করেছে প্রায় পৌনে তিনশত বৎসর পূর্বে ইউরোপে। চৌদ্দ শতাব্দির শেষ দিকে এর জন্ম এবং আড়াইশত বৎসর প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর ১৮ শতাব্দীতে এটা একটি বিজয়ী মতাদর্শ হিসাবে পৃথিবীতে স্বীকৃতি পায়। যে ইউরোপে এই ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্ম সেই ইউরোপের তৎকালীন পরিস্থিতি আমাদের অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা ইউরোপের তদানিন্তন পরিবেশ পরিস্থিতির ধারণা না পেলে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের সঠিক অবস্থা উপলব্ধি করা আমাদের জন্য কষ্টকর হবে।

পনের শতাব্দীতে ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে সবেমাত্র চর্চা শুরু হয়েছে। তদানিন্তন পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। বর্তমান পৃথিবীতে উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষেরা যেমন পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গিয়ে ধর্না দেয়, তখনকার যুগেও মানুষেরা উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করার জন্য মুসলমানদের নিকট ধর্না দিত। গোটা ইউরোপবাসী মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র বিন্দু আলহামরা, কর্ডোভা, গ্রানাডায় গিয়ে ভীড় জমাতো। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতা খৃষ্ট পূর্বযুগে নেতৃত্ব দিয়েছিল। যুগের বিবর্তনে গ্রীক সভ্যতা ইতিহাসের অতলান্তে হারিয়ে যায়। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ইসলামের বিজয় কেতন উড়তে থাকে। সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় মুসলমানেরা নেতৃত্ব দিতে থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানের সিংহ ভাগই মুসলমানদের অবদান। পনের শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত গোটা ইউরোপ ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিমিরাচ্ছন্ন। সভ্যতার দিক থেকে তারা ছিল অনগ্রসর। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের শিক্ষা গুরু ছিল মুসলমানরা। মুসলমানদের কাছে থেকেই ইউরোপবাসী প্রথম বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে। নবতর প্রযুক্তি আবিষ্কারের প্রেরণা তারা মুসলমানদের নিকট থেকেই পায়। এ

www.pathagar.com

কথা কারো অবিদিত নেই যে, সুমহান ইসলামের কারণেই একটি বর্বর অসভ্য আরবীয় বেদু ঈনরা ইসলামের সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে তারা স্বর্ণ যুগের সূচনা করেছিল।

১২ শতাব্দীর পর থেকে মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিয়ে বিলাসীতার গড্ডালিকা প্রবাহে গায় ভাসিয়ে দেয়। তারা চিন্তা গবেষণা ছেড়ে দিয়ে অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা তাদের পূর্বসুরীদের সাধনা লব্ধ জ্ঞান সম্পদের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন গতানুগতিক ধারায় অতিবাহিত করতে থাকে। অপরদিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি মুসলমানদের ন্যায় ঘুমিয়ে সময় ব্যয় করেনি। মুসলমানদের কাছ থেকে ইউরোপবাসী জ্ঞানের সামান্য যে আলোটুকু পেয়েছিল, তার উপর নির্ভর করে তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকে।

মুসলমানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সামান্য প্রদীপের উপর ভিত্তি করে অমুসলিম ইউরোপীয়রা ক্রমেই পৃথিবীতে অগ্রসর হতে থাকে। এ কথা অবশ্যই চরম সত্য যে, পৃথিবীতে বিজ্ঞান সাধনায় তথা চিন্তার জগতে যে জাতি যত বেশি অগ্রসর স্বাভাবিক কারণেই পৃথিবীতে সে জাতিই নেতৃত্ব দিয়েছে। মুসলমানরা যখন চিন্তার রাজ্যে তথা বিজ্ঞান সাধনায় অগ্রসর ছিল, তখন এই পৃথিবীর নেতৃত্বে ছিল মুসলমানদের হাতে।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে যারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে, বিজ্ঞান সাধনার নেতৃত্বও তাদেরই হাতে। কোরআন শরীফে মুসলমানদেরকে বার বার উৎসাহিত করা হয়েছে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, বারো শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্তও মুসলমানরা ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে। চিন্তা গবেষণার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অবস্থা দেখলে মনে পড়ে হ্যামিলনের সেই বংশীবাদকের কথা। কে যেন একজন বাঁশি বাঁজিয়ে চলেছে আর তার সেই বাঁশির ঐন্দ্রজালিক সুরের মুর্ছনায় মুর্ছিত হয়ে, গোটা মুসলিম জাতি নিশ্চিত ধ্বংস গহব্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখনও তারা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের দাসত্ব করে যাচ্ছে। মুসলমানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সামান্য আলো নিয়ে যখন ইউরোপের বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ইউরোপে শাসন চলছিল খৃষ্টান পাদ্রীদের। গোটা ইউরোপবাসীর উপরে জাযকতন্ত্র তথা পোপ তন্ত্র জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। ধর্মের নামে পাদ্রীরা গোটা

www.pathagar.com

ইউরোপে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল। মানুষের জীবনের প্রতিটি বিভাগ পরিচালিত হতো পাদ্রীদের নির্দেশানুযায়ী। প্রসংগত স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য যে, এই পনের শতাব্দীতেই আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষতা জন্ম লাভ করে এই ইউরোপেই। যেখানে চলছিল পাদ্রীদের যাজকতন্ত্র। পাদ্রীরা ধর্মের নামে জনগণকে শাসন করতো। নিজেরা বিভিন্ন ধরনের আইন কানুন তৈরী করে তা জনগণের উপর চাপিয়ে দিত। যেহেতু রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল তাদের হাতে, সেহেতু নিজেদের তৈরী আইন তা যত খারাপই হোক না কেন, তা ধর্মের নামে তথা খোদার নামে চালিয়ে দিত। পাদ্রীরা খৃষ্টধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের আনুগত্য করার জন্য জনগণের উপর চাপ প্রয়োগ করতো। অথচ আল কোরআন ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, খৃষ্টানদের নিকট আল্লাহর বিশুদ্ধ বাণী নেই। কোরান ঘোষণা করলো যে, খৃষ্টানরা যা আল্লাহর বানী বলে দাবী করছে, তা আল্লাহর বাণী নয়। যে ধর্মের আনুগত্য করার জন্য তারা মানুষকে আহবান জানাচ্ছে, যে ধর্ম দিয়ে তারা মানুষকে শাসন করছে, যে আইন কানুনকে তারা আল্লাহর দেওয়া আইন কানুন বলে দাবী করছে, তা আসলে তাদেরই মনগড়া।

খৃষ্টান যাজকগণ নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য মনমস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা ধারাকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আইন বলে চালাচ্ছে। এ কথা এই আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ জন্ম নেবার প্রায় আটশত বছর পূর্বেই আল্লাহর কোরআন ঘোষণা দিয়েছিল।

যেহেতু ইসলাম তার সকল কল্যাণকর বৈশিষ্ট নিয়ে তখনও ইউরোপে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করেনি, সে হেতু গোটা ইউরোপবাসী তখনও প্রকৃত ইসলামের তথা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নবী মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত ধর্মের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনি। তাই তারা প্রকৃত ধর্ম বলতে ঐ যাজকতন্ত্র তথা পোপতন্ত্রকেই বুঝেছিল। যদি তারা প্রকৃত ইসলামের সন্ধান পেত, তা হলে তারা এই চরম আত্মঘাতি মতবাদ তথা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের জন্ম দিত না। পোপতন্ত্র চিন্তা গবেষণা করে কোন কিছু আবিস্কার এবং এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের রহস্য উন্মোচনের পথে বাধার বিন্ধাচল তৈরী করে রেখেছিল। পাদ্রীদের আনুগত্য না করলে জনসাধারণকে চরম নিষ্ঠুর নির্মম দন্ড ভোগ করতে হতো। যা সর্ব সাধারণের নিকট এক নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা হিসাবেই পরিচিত হতে থাকে। ধর্ম

www.pathagar.com

সম্পর্কে তদানিন্তন ইউরোপবাসীর প্রকৃত জ্ঞান না থাকার দরুন পাদ্রীদের প্রবর্তিত মতবাদকেই তারা ধর্ম বলে জেনেছে এবং এই ধর্মের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্মীয় শৃঙখল তথা অত্যাচারী খোদার হাত থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম শুর করে। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে যদি মুসলমানরা প্রকৃত ইসলাম নিয়ে তাদের সামনে পেশ করতো, তা হলে তারা একথা বলতে পারতো না যে, সকল অনাচারের মূলই হচ্ছে ধর্ম।

বিজ্ঞানী ও পাদ্রীদের সংঘাত

ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা যখন গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নতুন দিগন্তে প্রবেশ করলো তখন পাদ্রীদের মনগড়া কাল্পনিক মতবাদ বিজ্ঞানীদের নিকট ততই ভ্রান্ত বলেই প্রতিয়মান হতে লাগলো। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য বিজ্ঞানাদের নিকট যত বেশী উদঘাটিত হতে লাগল, পাদ্রীদের সাথে নতুন জ্ঞান সাধকদের মত বৈষম্য ততবেশী প্রকট থেকে প্রকটতর হতে লাগলো। জ্ঞান সাধকরা ক্ষমতাসীন পাদ্রীদের প্রতিটি পদক্ষেপ চরম ভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণ করতে লাগলো। পাদ্রীরা শেষ রক্ষার জন্য তখন ধর্মের নামে জিগির তুললো। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়েও যখন মানুষকে জ্ঞান সাধনা থেকে বিরত রাখা গেল না, তখন পাদ্রীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণকে জ্ঞান সাধনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। যারা পাদ্রীদের আদেশ অমান্য করে জ্ঞানের নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে চললো, তারা পাদ্রীদের রোষানলে পতিত হলো। তাদের উপরে নেমে এলো চরম নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। জ্ঞান সাধকরা দৈহিক নির্যাতন থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত ভোগ করতে লাগলো।

গ্যালিলিওর ন্যায় অনেক বিখ্যাত জ্ঞানতাপসরাও পাদ্রীদের প্রভুত্ব অস্বীকার করার দরুন চরম দন্ড ভোগ করলো। পাদ্রীদের এই অমানষিক আচরণের ফলে যা হবার তাই হলো। চিন্তা ও গবেষণা ভিত্তিক জ্ঞানের অনুসন্ধানীদের উপর পাদ্রীদের অত্যাচারের বিরূদ্ধে সমাজের সুধীমন্ডলী ও চিন্তাশীলদের মনে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠলো। পাদ্রীদের যাজকতন্ত্র যতই ভুল বলে প্রামাণিত হতে লাগলো বিদ্রোহীরা ততই ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। কেননা বাঁধন যত তীব্র হয় বাঁধন ছেঁড়ার তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়। ধর্মের নামে পাদ্রীদের এই অধার্মিক আচরণ জনগণের মনে তীব্র ধর্ম বিদ্বেষ সৃষ্টি করলো। সমাজে জ্ঞানীগুনি এবং সুধীরা ধর্মকে প্রগতি ও জ্ঞান সাধনার বিরোধী এবং সকল প্রকার কল্যাণের

www.pathagar.com

পথে বাধার বিন্ধাচল বলে ভাবতে শুরু করলো। ধর্মকে পৃথিবী থেকে নির্মুল করার জন্য তারা এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

গীর্জা বনাম রাষ্ট্র

বিদ্রোহীরা প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললো। ক্রমশঃ পাদ্রীদের সাথে জ্ঞান অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীদের বিদ্রোহ সংঘাতের দিকে এগিয়ে চললো। পাদ্রীদের হাতে রাষ্ট্র শক্তি থাকায় তারা প্রশাসন ও ধর্মান্ধ জনতার সহযোগিতায় বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধ গড়ে তুললো। পক্ষান্তরে জ্ঞান সাধকরা জীবনের সমস্ত প্রকার বিভাগকে পাদ্রিদের প্রভাব মুক্ত করার জন্য আমরণ সংগ্রাম শুরু করলো। দীর্ঘ দুই শত বছর ধরে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চললো। ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট এই ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ "গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের" সংগ্রাম নামে পরিচিত। এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মানুষের মন থেকে কাউকে খোদার প্রতি অবিশ্বাসী বানানো যায় না। আবার খোদার প্রতি বিশ্বাসহীন ব্যক্তিকেও বিশ্বাসী বানানো যায় না। কারণ ধর্ম হলো একান্তভাবেই মনের ব্যাপার। মন যদি কোন বিশ্বাসকে লালন করে, তাহলে তা কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতেও করতে পারে। ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিয়ে মনের মনিকোঠা হতে বিশ্বাসকে দমিয়ে দেওয়া যায় না। আবার ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি চরম নির্যাতনের মুখে বাহ্যিক দিক দিয়ে ধর্মকে স্বীকৃতি দিলেও অন্তরে থাকে কপটতা, তেমনি দীর্ঘ দুইশত বছর সংগ্রাম করে ইউরোপে পাদ্রী ও জ্ঞান সাধকরা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। দুই পক্ষই বিব্রত হয়ে পড়লো।

পরিশেষে সংস্কারবাদীদের হস্তক্ষেপে দুই পক্ষের মধ্যে আপোষের প্রচেষ্টা শুরুহলো।

লু–থারের আপোষ প্রস্তাব

মার্টিন লুথার নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কিছু সংস্কারবাদীরা পাদ্রী ও জ্ঞান সাধকদের নিকট আপোষ প্রস্তাব পেশ করে। ইতিহাসে এই প্রস্তাব "আপোষ আন্দোলন" নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবের মূল কথা ছিল "ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে, ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ধর্ম পালন করবে, ইচ্ছে না করলে

www.pathagar.com

ধর্ম পালন থেকে বিরত থাকবে। ধর্ম মানুষের সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার। ধর্মীয় বিভাগ পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে গীর্জার পাদ্রীদের হাতে। ধর্ম মানুষের পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করবে না। এ সকল বিভাগ থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। পার্থিব কোন ব্যাপারেই পাদ্রীদের কর্তৃত্ব চলবে না। অবশ্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনার শপথ গ্রহণ করবে গীর্জার পাদ্রীদের হাতে"। সংস্কারবাদীরা ধর্ম নিরপেক্ষতাকে এখানে আধুনিক রূপদান করে মানুষের জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেললো। সকল দিক বিবেচনা করে পাদ্রী ও জ্ঞান সাধকরা সংস্কারবাদীদের এই প্রস্তাব তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে মেনে নিল। কারণ পাদ্রীরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল। দুইশত বছর ধরে সংগ্রাম করে তারা বিজয়ের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা বুঝেছিল, সমাজের জ্ঞানী ও সুধীদের বাদ দিয়ে শুধু মাত্র ধর্মান্ধ জনতার সাহায্য নিয়ে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা যায় না। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দকে গীর্জার পাদ্রীদের কাছে শপথ গ্রহণ করতে হবে, প্রস্তাবে এটা উল্লেখ থাকায় পাদ্রীরা নিজেদের সম্মান কিছুটা রয়েছে বলে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হলো। অন্যদিকে ধর্ম বিদ্রোহীরা যদিও সংগ্রাম শুরু করে ছিল, কিন্তু তারা এ চিন্তা করেই মার্টিন লুথারের প্রস্তাব গ্রহণ করলো যে, পার্থিব জীবনের কোন বিভাগেই যদি গীর্জা বা ধর্মের কোন প্রভাব না থাকে, তা হলে এই অথর্ব ধর্ম হবে খেলনার বস্তু। ধর্মকে মেনে চললে বা অমান্য করলেও এমন কোন শক্তি নেই, যে শক্তি ধর্ম পালন করার জন্য বাধ্য করবে। বিদ্রোহীরা ধর্মীয় বিভাগ গীর্জার হাতে ছেড়ে দিতে আপত্তি করলো না। রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দও রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করার সময় পাদ্রীদের হাতে শপথ গ্রহণ করতে রাজী হলো। ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত অসহায় পাদ্রীদেরকে এই সামান্য একটু ছাড় দিতে তারা আপত্তি তুললো না। এই ইউরোপে গীর্জা ও রাষ্ট্রের সংগ্রামে যা ঘটে গেল এবং যে আপোষ প্রস্তাব গ্রহণ করে উভয় পক্ষের সংগ্রামের পথ পরিহার করলো, ঐ আপোষনামা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখার মত কিছু আছে।

ভাবনার বিষয় বস্তু

এভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে নির্বাসন করার সংগ্রাম বিরাট সাফল্য লাভ করলো। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের এই বিজয়ী সংগ্রাম সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে একাগ্রচিত্তে গুরুত্বের সাথে চিন্তা করে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

যে ইউরোপে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের আধুনিক সংস্করণ জন্ম লাভ করে, সেখানে জীবনের সকল বিভাগে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রবল প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইউরোপবাসীর জীবনে এমন কোন দিক ছিল না, যা পাদ্রীদের ভ্রান্ত যাজকতন্ত্রের প্রভাব মুক্ত ছিল। সেখানে ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রবেশ করেনি। পার্থিব প্রয়োজনে বস্তুগত ও জড় জীবন সম্পর্কে ইউরোপবাসীরা মুসলমানদের নিকট থেকে যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছিল, তা পরিপূর্ণ ইসলামী জ্ঞান ছিল না এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। ইসলামের সকল কল্যাণকর বৈশিষ্টসহ মুসলমানরা ইউরোপবাসীর নিকট ইসলামকে তুলে ধরতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে ছিল। কারণ সে সময়টি ছিল মুসলিম সভ্যতা তথা মুসলমানদের পতনের সময়। নবী মোহাম্মদ (দঃ) মুসলমানদের উপরে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েদিয়েছেন, সে দায়িত্ব পালনে তারা সে সময় চরম অবহেলারই পরিচয় দিয়েছিল। জ্ঞানতাপসরা যখন গীর্জার পাদ্রীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে, তার পূর্বেই যদি মুসলমানরা পরিপূর্ণ ইসলামকে ইউরোপবাসীর নিকট তুলে ধরতো, যা তাদেরই দায়িত্ব ছিল, তা হলে হয়তো বা আজ ইউরোপের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো।

ইসলামের কল্যাণকর দিকগুলি যদি ইউরোপ বাসীর সামনে পরিস্কার থাকতো, তাহলে মার্টিন লুথারের আত্মঘাতী মতবাদ তথা ধর্ম নিরপেক্ষতা নামক বিষবৃক্ষের ছায়াতলে মুক্তি পাগল ইউরোপ বাসীরা আশ্রয় গ্রহণ করতো না। সে সময় মুসলমানরা বর্তমান যুগের ন্যায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ভুলে গিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং ভোগ বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। শোষিত নিপিড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির দিশারী, আন্তর্জাতিক নেতা বিশ্ব নবী জনাবে মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ (দঃ) যে ভাবে ইসলামকে মানুষের সামনে মুক্তি সনদ হিসাবে তুলে ধরছিলেন এবং ইসলামকে মানুষের সামনে যে পদ্ধতিতে পেশ করার পথ প্রদর্শন করেছিলেন, ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলমানরা যদি তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে অনুসরণ করে এবং বিশ্ববাসীর সামনে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতো তা হলে ইউরোপীয় রেনেসাঁ নতুন খাতে প্রবাহিত হতো।

তখন প্রয়োজন ছিল, ইসলাম পাদ্রীদের ন্যায় কোন মনগড়া মতবাদ নয়, এটা একটি ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা, একথা বাস্তবতার মাধ্যমে ইউরোপের কাছে পরিস্কার করে তুলে ধরা। সুতরাং ইতিহাসে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ধর্মের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল ইউরোপে। যেখানে ছিল ধর্মের নামে খৃষ্টান পাদ্রীদের যাজকতন্ত্র। সুতরাং ঐ বিদ্রোহ ছিল যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নয়। অতএব ধর্ম নিরপেক্ষতা অমুসলিমদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হলে হতেও পারে, কিন্তু ইসলামের অনুসারী কোন মুসলমানের কাছে গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার অধিকার দেয় না। জীবনের এক ভাগে অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে ইসলাম থাকবে, আর পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম থাকবে না, এ অধিকার ইসলাম মুসলমানদেরকে দেয় না। ইসলাম কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্মের নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। একটি বিশাল মতাদর্শের নাম। যারা আজকে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে চায়, তাদের চিন্তা করা উচিত এ অধিকার ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে কি – না?

যখন ইউরোপে খৃষ্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়, তখন খৃষ্টান পাদ্রীদের কাছে আল্লাহর বিধান ছিল না। পাদ্রীরা খোদার নামে যে ধর্ম প্রচার করতো এবং মানুষকে যে ধর্মের আনুগত্য করার দাবী জানাতো তা আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ছিল না। এখানে আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এটা ঐ পনের শতাব্দীরকথা।

ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ মহা-গ্রন্থ আল-কোরআন ঘোষণা দিয়েছে যে, ইসলামই এক মাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। কোরআন এ ঘোষণাও দিয়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষেরা যা কিছু ধর্ম জ্ঞানে আঁকড়ে ধরে আছে, তা সবই ভুল। সুতরাং এ কথা কোরআনের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, খৃষ্টান পাদ্রীরা ধর্মের নামে যা চালাচ্ছিল তা, তাদেরই মনগড়া মতবাদ। তারা খৃষ্ট পূর্বগ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর নিজেদের ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে গোটা বিশ্ব যতই উদ্ভাসিত হতে লাগলো, পাদ্রীদের তথাকথিত ধর্মীয় মতবাদ ততই ভ্রান্ত ও সংশয়পূর্ণ বলে মানুষের কাছে প্রতিভাত হতে লাগলো। এ অবস্থায় খৃষ্টান পাদ্রীরা এ চিন্তা করলো যে, এই জ্ঞান অনুসন্ধানীরা মুল ধর্মকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং পাদ্রীরা স্বাভাবিক কারণেই বিজ্ঞান চর্চার প্রবল বিরোধিতা করতে লাগলো। তারা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে, শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলো। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের এ বিদ্রোহ ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না, পাদ্রীদের বিরুদ্ধেই

www.pathagar.com

ছিল বিজ্ঞানের বিদ্রোহ।

নতুন জ্ঞান সাধকেরা প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল বলে, তারা ধর্মকে উন্নতি ও প্রগতির বিরোধী বলে মনে করতে লাগলো। ফলে নতুন বিজ্ঞানীরা ধর্মের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম শুরু করে দিল। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহাতিত ভাবে প্রমাণিত হলো যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোন সংঘর্ষ হয়নি। সংঘর্ষ হয়েছে খৃষ্টান পাদ্রীদের মনগড়া ধর্মের সাথে। আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞান যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে অথবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার কোনটাই আল্লাহ ও তার রছুলের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে প্রমাণিত করতে পারেনি। যে কয়টি বিষয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা ইসলামের নীতিবিরোধী বলে মনে হচ্ছে, তা এখনও থিউরির পর্যায়ে রয়ে গেছে। চরম সত্য বলে এখনও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, করবেও না ইনশাল্লাহ। ইসলামের সাথে বিতর্কিত বিজ্ঞানের নীতিমালা সমূহ বাস্তব তথ্য দ্বারা সংশয়হীন ভাবে স্বয়ং বিজ্ঞানীদের কাছেও এখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি।

মুসলমান এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ

চুলচেরা বিশ্লেষণে উপরে যা আলোচনা করা হলো তা ইতিহাসের আলোকে চরম সত্য। মধ্যযুগের ইউরোপীয় শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা এ কথা নিশ্চয়ই বলবেন যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান সাধকেরা তথাকথিত ধর্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল, তা ছিল পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রকৃত ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, বর্তমানে বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা কেন ধর্ম নিরপেক্ষতার স্বপক্ষে কথা বলে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, ইসলাম বিবর্জিত আধুনিক জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলমানেরা ইসলাম সম্পর্কে বলতে গেলে প্রায় অজ্ঞ। ইউরোপের ইতিহাসে যখন তারা পড়ছে যে, সেখানে ধর্ম ছিল প্রগতির অন্তরায়। এখানেও তারা মনে করছে যে ইসলাম হলো প্রগতির অন্তরায়। ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে এই মুসলমানেরাও ইসলামকে পাদ্রীদের পোপতন্ত্রের ন্যায় ধারণা করতে বাধ্য হচ্ছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে কতগুলি তথ্য পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যারা জ্ঞান চর্চা করেছেন তারা ইসলাম সম্পর্কে

www.pathagar.com

অনেক অমুসলিম চিন্তা নায়কদের চেয়েও ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে পিছিয়ে আছেন। বিশ্বের বড় বড় অমুসলিম চিন্তাবিদরা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ যখন করছে, তখন তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদরা ভ্রান্ত মতবাদ মতাদর্শ নিয়ে গবেষণায় বিভোর হয়ে আছে।

এই শ্রেণীর মুসলিম চিন্তা নায়করা পৃথিবীর অনেক আদর্শ নিয়েই চিন্তা গবেষণার সময় পান, কিন্তু সময় পান না শুধু ইসলামকে নিয়ে একটু মাথা ঘামানোর। বিভিন্ন থিউরির বই ক্রয় করার জন্য মুসলিম চিন্তা নায়করা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যান, কিন্তু আপন ঘরে বাক্স বন্দী কোরআন শরীফটি খুলে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। অপর দিকে মুসলমানদের মধ্যে যারা কোরআন হাদিসের চর্চা করেছেন, ইসলাম নিয়ে গবেষণায় রত আছেন, তাদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত নয়। তারা বিজ্ঞান চর্চা করেন না। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে কোরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞান চর্চাকে হারাম ফতোয়া দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছেন। ফলে বস্তু জগতকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে না পারার কারণে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে তারা নেতৃত্ব দানে সক্ষম হচ্ছেন না। দীর্ঘ সময় ধরে অনৈইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শাসনের ফলে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের সকল দিক থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে, ফলে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত, অথচ ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র শূন্য মুসলমান ব্যক্তিদের নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে পরিণতিতে যা হবার তাই হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা উঠলেই এই ইসলামী শিক্ষাহীন আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বিরোধীতা করছে।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে এ কথা নিঃসন্দেহা-তীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান ও চিন্তা গবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এই মানব সভ্যতা নামক গাড়ীটাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞান সন্ধানীরা তথা বিজ্ঞানীরাই এই মানব সভ্যতা নামক গাড়ীটার পরিচালক। গাড়ীর পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ীই গাড়ীর যাত্রীদেরকে গাড়ীর মধ্যে থেকে এগিয়ে যেতে হয়। মুসলমানেরা যতদিন পর্যন্ত এই মানব সভ্যতা নামক গাড়ীটার পরিচালক ছিল অর্থাৎ চিন্তা গবেষণা জ্ঞান সাধনার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ততদিন, ইসলামী চিন্তা ধারায়ই মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, ভাল মন্দ, সুন্দর, কুৎসিত সব কিছুর মানদন্ড ছিল ইসলাম।

ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলনের ফলে খোদাহীন চিন্তাধারার প্লাবনে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত মুসলিমদের তৃন খড় কুটার ন্যায় ভেসে যাওয়াটা আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের খোদাহীন বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার যে গাড়ী দুর্বার গতিতে মানব মন্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে ইসলামী শিক্ষা বর্জিত মুসলিম এমন কি ধার্মিক বলে পরিচিত মুসলিম ব্যক্তিদেরও ভেসে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

দাসত্ব সাধারণতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো চিন্তার দাসত্ব বা মানষিক দাসত্ব। অপরটি হলো রাজনৈতিক দাসত্ব। বর্তমানে চিন্তার ক্ষেত্রে তথা মানসিক দাসত্ব মুসলিম নেতৃত্বকে সর্বদিক থেকে নিস্ক্রীয় করে রেখেছে। তারা পাশ্চাত্যের অন্ধ পূজারী সেজেছেন। পাশ্চাত্যের দীক্ষা গুরুদের নিকট নিজেদের সবকিছু বিক্রয় করেছেন বা বন্ধক দিয়ে বসে আছেন। এই তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বাধীন চিন্তাধারা কিছু আছে বলে মনে হয় না। এরা সব কিছু অবলোকন করে, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, বৃটেন ও ভারতের চোখ দ্বারা। সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহের দেওয়া ঠুলি চোখে লাগিয়ে এরা নিজেদের উন্নতি অবনতির খতিয়ান দেখে। এদের কাছে পাশ্চাত্যই হলো সব কিছুর মানদন্ড। ইউরোপীয় দেশসমূহ যদি রাতকে দিন বলে, এরাও অবলীলাক্রমে ইউরোপীয় মরুব্বীদের সুরে সুর মিলিয়ে কোরাশ গাইতে থাকে এখন রাত নয়, দিন। ইউরোপীয় মুরুব্বীরা যখন অর্ধনগ্ন হওয়াকে প্রগতি বলে মনে করে, তখন এরা কাপড় চোপড় পরনে যা আছে, সব কিছু খুলে পরিপূর্ণ নগ্ন হওয়াকে প্রগতির শেষ স্তর বলে মনে করে। ইউরোপীয় মহিলারা যখন কৃত্রিম উপায়ে চোখের ভুঁরুর সৌন্দর্য্য বর্ধন করে, তখন এদেশের পাশ্চাত্যের মহিলা গোলামরা চোখের সমস্ত ভুঁরু উপড়ে ফেলে কালো কালী দিয়ে যুগোল ভুঁরু তৈরী করে।

ডঃ কবি ইকবাল তাই দুঃখ করে বলেছেন,

সভ্যতা সাংস্কৃতিতে হিন্দু তুমি
ভেশ ভূষাতে খৃষ্টীয়ান

এমনি মুসলমান তুমি, ইহুদিও তোকে দেখে করে লজ্জাজ্ঞান। ইউরোপের এসব মানস পুত্ররা যদি মানসিক দাসত্ব ত্যাগ না করেন তা হলে, এর অনিবার্য্য

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক দাসত্ব নেমে আসবে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলির উপর। প্রাকৃতিক সম্পদ সহ বিভিন্ন সম্পদে মুসলিম দেশগুলি সমৃদ্ধ হওয়ার পরেও, মানসিক গোলামী থেকে মুক্ত না হওয়ার কারণে বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক গোলামী ও সাংস্কৃতিক গোলামী করতে তারা আজ বাধ্য হচ্ছে। নিজেরাও পাশ্চাত্যের গোলামীর জিঞ্জির গলায় পরিধান করেছে এবং সরলপ্রাণ গোটা মুসলিম জাতির গলাতেও ঐ একই জিঞ্জির পরিয়ে রেখেছে।

আজ সময় এসেছে সকল প্রকার গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে স্বকীয় আদর্শকে আঁকড়ে ধরার। এই মুসলিম নামক ঘুমন্ত শার্দুলদের ঘুম ভাঙ্গানোর সময় এসেছে। কোরআন হাদিসের জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যশালী ঐ আলেম সমাজেরই দায়িত্ব এটা। আল কোরআনের জ্ঞানের মশালে অগ্নি স্পর্শ করানোর দায়িত্ব আলেম সমাজের। শতকোটি মুসলিম যুবকদের কাছে ইসলামকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে না পারার কারণে, বীর কেশরী খালেদ মুছা তারিক ও সালাউদ্দিনের উত্তরসুরী এই মুসলিম যুবকেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামে পরিণত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাম্যমৈত্রীর বাণী বাহক, নবী সম্রাট মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (দঃ) যেভাবে মানুষের কাছে ইসলামকে পেশ করতে শিখিয়ে গেছেন, ঐ শিক্ষানুযায়ী আজকেও কোরআন হাদিসে অভিজ্ঞ আলেম যদি ইসলামকে জাতির সামনে পেশ করেন তাহলে ঐদিন বেশী দুর নয়, যে দিন গোটা বিশ্বব্যাপি আবার হেরার রাজ তোড়ন প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। কেননা শান্তি পিয়াসী মানব মন্ডলী আজ শান্তির আশায় হন্যে হয়ে ফিরছে, নিজেদের আবিস্কৃত কোন মতবাদ মতাদর্শ এদেরকে শান্তি দিতে চরমভাবে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে। শিশিরবিন্দু সম শান্তির আশায় এরা হোয়াইট হাউজ, ক্রেমলীন, চীনের লাল প্রাচীর ও ভারতের ত্রীমুর্তি ভবন সহ সব জায়গায় গিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসেছে। সমস্ত ধরনের মতবাদ মতাদর্শের বাস্তব পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখেছে এই মানব সমাজ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য শান্তির বদলে অশান্তির দাবানল গোটা বিশ্বময় আলোর গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই মানব মন্ডলীই প্রযুক্তিগত বিদ্যায় তারা প্রগতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করেছে। এমন ধরনের উড়ন্ত যন্ত্রযান তারা আবিষ্কার করেছে যে, ইচ্ছা করলেই মুহূর্তের মধ্যেই এরা এই পৃথিবী নামক গ্রহটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে প্রকৃতির অপরূপ নয়নাভিরাম, চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী অবলোকন করে ক্লান্ত দেহ মন স্নিগ্ধতায় ভরপুর করে আনতে পারে। অক্লান্ত পরিশ্রমে

www.pathagar.com

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে কাজ শেষ হবে, সেই কাজগুলি তড়িত গতিতে শেষ করার মত বিভিন্ন যন্ত্র এরা উদ্ভাবন করেছে। নিজেদের প্রতিকৃতি ও কণ্ঠস্বর যুগ যুগ ধরে, ধরে রাখার মত কৌশল তারা আয়ত্বাধীন করেছে। বিজ্ঞানের অবদানে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে এই মানুষেরা নিজেদের ভোগ বিলাস ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের সামগ্রীর সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা গোটা বিশ্বময় প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র আবিষ্কার এরা করেছে, যা দিয়ে এই সুন্দর সবুজ শ্যামল বিথিকায় পরিপূর্ণ গোটা ধরনীকে নিমিষে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা যায়।

কিন্তু পেরেছে কি, এমন কোন মতবাদ মতাদর্শের আবিস্কার করতে, যে মতবাদ গোটা পৃথিবীর মানব সমাজের কাছে সমভাবে প্রযোজ্য? উদ্ভাবন করতে পেরেছে কি, এমন আদর্শের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে মুছে যাবে মানুষের হৃদয় আকাশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার কালোমেঘ? মানুষ সক্ষম হয়েছে কি এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে, যা বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী থেকে দুরীভূত হবে বর্ণবাদী দৃষ্টিভংগী? এমন কোন সার্বজনীন বিধান তৈরী করতে এই সভ্যতা গর্বিত মানব সমাজ পেরেছে কি, যা গ্রহণ করলে প্রতিটি ব্যক্তি ফিরে পাবে তাদের জন্মগত অধিকার? পৃথিবীর সকল চিন্তাবিদরাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন, না! এমন কোন কিছুর আবিস্কার করতে গোটা বিশ্বের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। একটি অশান্তি দূর করতে গিয়ে তারা আরো দশটি অশান্তির শাখা মুখ খুলে দিয়েছেন। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, এই সসীম জ্ঞান ব্যবহার করে এমন সার্বজনীন আদর্শ তৈরী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যার ছায়াতলে গোটা বিশ্ববাসী আশ্রয় নিতে পারে। অথচ গোটা বিশ্বের সাদা কালো ধনী গরীব বিভিন্ন ভাষাভাষির জন্য সমভাবে গ্রহণীয় একটি আদর্শ মানবতার ঐ মহান মুক্তির দূত নবীকুল শিরমনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব নবী মোহাম্মদ (দঃ) পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছেন চৌদ্দশত বছর পূর্বেই। যে আদর্শের ঝর্ণায় অবগাহন করে এই শান্তি তৃষ্ণার্ত মানব সমাজ পান করতে পারে শান্তির অমিয় ঝরণাধারা। কিন্তু আফসোসের বিষয়, যারা গোটা বিশ্বব্যাপি শান্তির ঝরণাধারা প্রবাহিত করবে তারা আছে আজ ঘুমিয়ে। কখন তাদের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাংবে আর বিশ্বব্যাপি অশান্তির বিরুদ্ধে বাজাবে প্রলয় শিখা, আর্ত–মানবতা আজ এই আশাতেই প্রহর গুনছে।

www.pathagar.com

যুক্তির কষ্টি পাথরে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ

ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদের ইতিহাস পড়ে এ ধারণা করা উচিত হবে না যে, চৌদ্দ শতাব্দীর শেষভাগে এই মতবাদ জন্ম লাভ করেছে। বলতে গেলে পূর্ণাংগ ধর্মের সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতার সংগ্রাম বিভিন্ন নবী কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের সাথে চিরন্তন। পৃথিবীতে যখনই কোন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জীবন বিধান নিয়ে এসে তা সমাজে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তখনই সমাজের ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠি, পুঁজিবাদী গোষ্ঠি ও শাসক গোষ্ঠি সম্মিলিতভাবে প্রবল বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে নবীদের বিরুদ্ধে। প্রায় সকল নবীই সমকালীন ঐ তিন গোষ্ঠির (ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠি, পুঁজিবাদি গোষ্ঠি ও শাসক গোষ্ঠি) পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন, তোমার আনিত ধর্ম গ্রহণ করলে তা শুধু ব্যক্তি জীবনেই মেনে চলতে হবে– না– জীবনের সকল বিভাগকেই ধর্মের আনুগত্যশীল করে দিতে হবে? নবীগণ জবাবে বলেছেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই আমার আনীত আইন মেনে চলতে হবে। তখনই নবীর সাথে ঐ তিন শক্তির বেধেছে সংঘাত। কোন নবীর সময়েই ধর্মকে অস্বীকার করা হয় নি। তারা শুধু দাবী উত্থাপন করেছে ধর্মকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করার।

ইব্রাহীম (আঃ) এর সময়ে নমরুদ এবং মূছা (আঃ) এর সময়ে ফেরাউন সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেনি। তারা ধর্মকেও অস্বীকার করতো না। ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা আজর ছিল নমরুদের দরবারের রাজ পুরোহিত। তারা শুধু ধর্মকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে মানতে অস্বীকার করেছে। আধুনিক পরিভাষায় নমরুদ ফেরাউনকেও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীই বলতে হবে। নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদুর রছুলুল্লাহর (দঃ) এর সময় যারা ইসলামের বিরোধীতা করেছে, আবু জেহেল আবু লাহাবসহ সে সময়ের ইসলাম বিরোধীতাকারীরাও ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল।

প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের মতবাদকে কোন দিক থেকেই শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে এই মতবাদের দুর্বলতাকে ঢাকতে পারেনি। যুক্তিকে পরিহার করে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা ঐ প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত অন্ধ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থের প্রলোভন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেই ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা সাধারণ মানুষের উপরে জোর করে

www.pathagar.com

এই ভ্রান্ত মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। কোন ধর্মনিরপেক্ষতা বাদীরা তাদের মতবাদ নিয়ে বিতর্কে আসতে নারাজ। কেননা তারা ভালো করেই জানে যে, যুক্তির কাছে তাদের এই হাস্যকর মতবাদ তৃনবত উড়ে যাবে। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের মত অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন মতবাদ আর একটিও পাওয়া যাবে না। সুতরাং যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ময়না তদন্ত ঘটবে।

এ বিশ্ব চরাচরের যদি কোন স্রষ্টা বা পরিচালক থেকেই থাকেন এবং সৌরজগতে যদি তার দেওয়া নিয়ম বা বিধান সমুহ কার্যকর বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে ঐ মহাশক্তিশালী স্রষ্টাকে মানুষের জীবনে একটি কার্যকর শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি করার কি কারণ থাকতে পারে? বস্তুজগতের একটি ক্ষুদ্রতম নিয়মকেও পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এমন কি মানুষ নিজের শারিরীক অংগ-প্রত্যংগ সমুহ স্রষ্টার দেওয়া যে বিধান অনুযায়ী এগুলি স্পন্দিত হচ্ছে, সেইগুলিও পরিবর্তন করে সুস্থ থাকতে পারে না সে মানুষ যত বড় বিজ্ঞানীই হোক না কেন? এমতাবস্থায় পার্থিব জীবনে মানুষের জীবন যাত্রা সুন্দরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে পরিচালনার জন্য বিশ্ব স্রষ্টার পক্ষ থেকে কোন বিধানকে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত কিভাবে যুক্তি ভিত্তিক হতে পারে? যে স্রষ্টার দেওয়া বিধান উদ্ভিদ জগতে সৌর মন্ডলে, প্রাণী জগতে প্রতিটি গ্রহ উপগ্রহ তথা বস্তু জগতের সর্বস্তরে চলছে, যে স্রষ্টার অনুগ্রহ ব্যতিত এক মুহূর্তের জন্যেও মানুষসহ কোন প্রাণী জীবন বাঁচায়ে রাখতে অক্ষম, সেই মহান স্রষ্টাকে মানব জাতির জীবনবিধান দাতা বলে স্বীকৃতি না দেওয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নিপেক্ষতাবাদীরা এখানে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এই মহাবিশ্বে স্রষ্টা নেই বলে ঘোষণা দেওয়ার দুঃসাহস ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের নেই, তাই তারা ধূর্ততার চোরা গলি অবলম্বন করে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে শিখন্ডীর মত নিয়মতান্ত্রীক শাসন কর্তার ন্যায় প্রভাব প্রতিপত্তিহীন এক অকর্মন্য দুর্বল সত্তা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে বোকা বানানোর অপরূপ কৌশল এঁটেছে। এ ধোকাবাজীর পথ অবলম্বন করে বাহ্যিক কতিপয় আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে সন্তুষ্ট এক শ্রেণীর ভীরু কাপুরুষ লোক ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকে স্বীকৃতি দিয়েও আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা জান্নাত পাবার দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে।

www.pathagar.com

অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার নামে প্রকৃত ধর্ম ইসলামকে উৎখাতের জন্য যখন কর্মসূচী গ্রহণ করে, তখন এই শ্রেণীর তথাকথিত ধার্মিকরা অবলীলা ক্রমে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদীদের ঘৃণ্য কর্মসূচী সমর্থন করে বসে। এই শ্রেণীর ধার্মিকরা ধর্মের আলখেল্লা পরে প্রকৃত ধর্মকেই পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করে আসছে আবহমান কাল ধরে। এই শ্রেণীর ভন্ড ধার্মিকদের সমর্থনেই টিকে থাকে আল্লাহর মাটিতে আল্লাহ বিরোধী সরকার। এদেরই সমর্থনে ময়দানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আল্লাহ রসূল বিরোধী শ্লোগান তথা ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল। এই তথাকথিত ধার্মিকদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ব্যক্তি, শাসক ও রাজনৈতিক দল সমূহ অন্তরে আল্লাহকে অবিশ্বাস করলেও মুখে আল্লাহকে স্বীকার করে এবং মাঝে মধ্যে মসজিদ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে ধর্মের নসিহতও খয়রাত করে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ও নবী (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ ও বিধান সমূহ ব্যক্তি জীবনে অনুসরণ করতে বাধা নেই বলে স্বীকার করে এবং পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ ও রাছুলের দেওয়া বিধানের প্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা করেন। তাহলে প্রশ্ন উঠে, কোন দলিলের ভিত্তিতে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা আল্লাহর সর্বব্যাপী নিরংকুশ ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত এলাকায় সীমাবদ্ধ করে? আল্লাহ কোথায়ও এ বিষয়ে কোন ইংগিত করেছেন কি? আল্লাহর কোন নবী ধর্ম নিরপেক্ষতার স্বপক্ষে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন কি? ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম তথা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করলেই আল্লাহ খুশি থাকবেন, এমন কোন কথা কোরআনে কোথাও বলেছেন কি? পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র, মানুষ নিজস্ব তৈরী আইন দিয়ে চালাবে এ অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন কি? ব্যক্তি জীবনে ধর্ম তথা ইসলাম গ্রহণ করে, আর পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম বর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা জান্নাত পাওয়া যাবে, এমন কোন ইংগিত কোরআনে আছে কি? ব্যক্তি জীবনে নামাজ রোযা হজ্জ যাকাত পালন করে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যার যেমন খুশী তেমনভাবে চলার অধিকার আল্লাহ দিয়েছেন কি?

www.pathagar.com

ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদীরা মানুষের ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ রাছুলের প্রবেশাধিকার স্বীকার করে কিন্তু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে আল্লাহ রাছুলের প্রবেশ পথে ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটি ফোর জারি করে, এ অধিকার ঐ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা কোথায় পেল? আজ যারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েও ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলন করছে এবং যারা ধর্ম নিরপেক্ষ দল বা গোষ্ঠির প্রতি সমর্থন দিচ্ছে, তাদের চিন্তা করার সময় এসেছে যে, আল্লাহ যদি রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মকে পালন করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন (নিশ্চয়ই দিয়েছেন) তাহলে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের নির্দেশ অনুসারে ইসলামকে শুধু ব্যক্তি জীবনে গ্রহণ করে আর রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে বর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি? আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই মানুষ পৃথিবীতে এসে কিভাবে চলবে, এ পথ যদি তিনি না দিয়ে থাকেন, তাহলে এমন অবিবেচক আল্লাহকে স্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? মানুষকে যখন আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠালেন তখন কি আল্লাহ জানতেন না যে, মানুষ পৃথিবীতে গিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ইত্যাদি গড়বে? যদি তিনি জেনেই থাকেন (নিশ্চয়ই জানতেন) তাহলে তার সৃষ্টি মানুষ কোন আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট গড়বে, সে আদর্শ দেওয়া কি আল্লাহর দায়িত্ব ছিল না?

আল্লাহ সবই জানতেন এবং সবকিছুই তিনি নবী (দঃ) এর মাধ্যমে দিয়েছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের কথা মেনে নিলে আল্লাহকে অবিবেচক বলে চিহ্নিত করা হয় না কি? যে আল্লাহ মানুষের অর্থনীতি, সমাজনীতি, শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, রাজনীতি তথা জীবনের সার্বিক বিধান দেন না, এমন অথর্ব বুদ্ধিহীন অক্ষম দুর্বল আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে সেজদা দেওয়ার যৌক্তিকতা আছে কি? যে আল্লাহ মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দেন না, মানব জীবন চলার সঠিক পথ যিনি দেখিয়ে দেননি, এমন অপ্রয়োজনীয় আল্লাহর প্রতি মানুষের মনে কিভাবে ভক্তি শ্রদ্ধার অনুপ্রেরণা জাগবে? যে আল্লাহ মানুষের সমস্যা বুঝেন না, মানুষের অন্তহীন সমস্যার কোন সমাধান দুনিয়াতে দেন নি, সেই আল্লাহ পরকালে শাস্তি বা পুরস্কার দান করবেন, এ কথা কি ভাবে মেনে নেওয়া যায়? যিনি গোটা বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সাথে নিজ বিধানানুযায়ী

www.pathagar.com

এগুলি পরিচালনা করছেন, সেই আল্লাহকে মানব জাতির বিধান দাতা বলে স্বীকৃতি না দেওয়ার পেছনে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে কোন যুক্তি আছে কি? আল্লাহকে শুধু ব্যক্তি জীবনে বা মসজিদের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে এবং পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এ ধৃষ্টতা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা কোথায় পেলো? আল্লাহ ব্যক্তি জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং পার্থিব জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নন, এমন কথা কোন নির্বোধ বিশ্বাস করবে কি? প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা আল্লাহকে মোটেও বিশ্বাস করে না। এরা ধর্মভীরু মানুষদেরকে ধোকা দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। নইলে মসজিদে আল্লাহর আইন চলবে আর মসজিদের বাইরে আল্লাহর আইন চলবে না, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের তৈরী আইন চলবে, এ কথা কেন তারা বলবে? মসজিদ আল্লাহর জায়গা, তিনি মসজিদের মাটিটুকুই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর বাকি মাটিটুকু কি অন্য অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে?

আল্লাহর সৃষ্টি জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায়, সৃষ্টি জগতের কোথাও কোন অব্যবস্থা বা অসামঞ্জস্য নেই। চন্দ্র, সূর্য্য অগণিত গ্রহ নক্ষত্রসহ ঐ দূর নীহারিকা কুঞ্জ তথা গোটা সৌরজগত চলছে মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া বিধান অনুযায়ী। মানুষের শরীরটার মধ্যেও জটিল শীরা উপশীরা, রক্ত প্রবাহ সব কিছু সুষ্ঠু নিয়ম মাফিক চলছে ঐ আল্লাহর সুন্দর বিধানানুযায়ী। কোথাও কোন বিশৃংখলা নেই। এ সব ব্যাপারে মহা বিজ্ঞানময় কোরআন শরীফ বার বার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ সবকিছু যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে চলে তাহলে আল্লাহর দেওয়া বিধানানুযায়ী মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ও সভ্যতা সাংস্কৃতিসহ যাবতীয় দিক কেন সুষ্ঠুভাবে চলবে না? তাহলে এ কথা এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব করতে না দিয়ে নিজেদের দাস বানাতে চায়। এরা নিজেদের তৈরী স্বার্থপর শোষণমূলক আইন দিয়ে মানুষকে শোষণ করে নিজেদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখতে ও মানুষকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়। যারা আল্লাহকেই শুধু দাসত্ব পাবার অধিকারী বলে মনে করে, তাদেরকে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী তথা ধর্মহীনদের বিরুদ্ধে সচেতন

www.pathagar.com

হতেহবে।

ব্যক্তিজীবনে ধর্মকে গ্রহণ ও পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়ার মতবাদ তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অত্যন্ত কুটিল ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ এবং দূরভিসন্ধিমুলক। যারা এ মতবাদের পক্ষে, তারা ব্যক্তি জীবনেও ধর্মের বন্ধন স্বীকার করতে রাজী নয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, "ধর্ম যদি ব্যক্তিগত ব্যাপারই হয়, তাহলে ধর্মকে মেনে চলেন না কেন"? তখন ঐ মতবাদের অনুসারীরা বলবে, ধর্ম মানা না মানা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ প্রশ্ন করাও অপরাধ। কেননা কারও ব্যক্তি জীবন নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার কারো নেই।

এর অর্থ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যে ধর্মকেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য এধরনের বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ প্রচার করে থাকেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই পৃথিবীতে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর নির্দেশ জারি করেও মানুষকে আইন মানানো যায় না। কোন অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত ঘোষণা দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে, তবুও মানুষ ঐ অপরাধ থেকে বিরত হয় না। মানুষের মধ্যে থেকে অপরাধ প্রবণতা বিদায় নেয় না। যদি সেখানে ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ পালন করার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়, ধর্মকে যদি ঐচ্ছিক ব্যাপারে পরিণত করা হয়, তা হলে পৃথিবীতে ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে কি? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এ কথা ভাল করেই জানে যে, ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার পরিণত করলে এবং ধর্মকে পালন করা না করার ব্যাপারে শাসন করার কেউ না থাকলে, ধর্ম এমনিতেই বিদায় নিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।

তাই তারা ঐ উদ্ভট মতবাদকে ধর্মহীন মতবাদ না বলে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই মূলতঃ ধর্মহীনতাবাদ। অতএব বোঝা গেল যে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা মূলতঃ নাস্তিক। ধর্মের প্রতি এদের কোন বিশ্বাস বা সহানুভূতি নেই। ধর্মের প্রভাব বিস্তার ঘটুক অথবা মানুষ ধর্মভীরু হোক, ধর্মীয় বিধিমালা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক, ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষেরা চরিত্র গঠন করুক, এ ধরনের কোন কর্মসূচী ধর্ম নিরপেক্ষ শাসক বা ধর্ম নিরপেক্ষ কোন দল দেয়না। ধর্ম কিভাবে মানুষের মধ্য থেকে বিদায় নিতে পারে এ ধরনের কর্মসূচী ধর্ম নিরপেক্ষ শাসক এবং ধর্ম নিরপেক্ষ দল সমূহ দিতে মোটেই

www.pathagar.com

কার্পন্য করে না। এদের প্রতিটি কর্মকান্ড লক্ষ্য করে দেখলেই অনুধাবন করা যায়, ধর্মকে কবরস্ত করতে এরা কত সিদ্ধহস্ত।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে, যা সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবন থেকে মোটেও বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে যারা ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন থেকে আলাদা করতে চায়, তারা অত্যন্ত দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে নিয়েই এধরনের অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন কথা বলে থাকেন।

এ ধরনের মতবাদ প্রচারের পিছনে থাকে উগ্র ভোগবাদ। কারণ ব্যক্তি জীবন যদি সমাজ জীবন থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে ব্যক্তি যতই উশৃংখল হোক না কেন, সমাজ ঐ উচ্ছৃংখলতা রোধ করতে এগিয়ে আসবে না, বিধায় উশৃংখল ব্যক্তি সীমাহীন যৌনাচার থেকে শুরু করে যাবতীয় অপকর্ম অবাধে করে যেতে পারবে। অবাধ ভোগ বিলাসের গড্ডালিকা প্রবাহে দেহমন ভাসিয়ে কল্পিত স্বর্গরাজ্যে ভ্রমণ করার অদম্য সাধই জন্ম দিয়েছে তথা কথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ। নির্জনে একাকী বসে যখন এক ব্যক্তি চিন্তা করে, তখনও সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়। কোন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিবাজ হয়ে সামাজিকভাবে সাধুবাদের অবতার বনে যেতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও স্বীকার করতে বর্তমানে বাধ্য হচ্ছে যে, ধর্ম মানুষকে সৎ হতে সাহায্য করে, ধর্ম মানুষের মধ্যে সুপ্রবৃত্তির জন্ম দেয়।

যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে, এক ব্যক্তি ধর্মীয় নীতিমালা ব্যক্তি জীবনে পালন করে যদি চরম সৎ হয়ে যায়, তখন ঐ সৎ ব্যক্তি তার সততা কোথায় বাস্তবায়িত করবে? ধর্ম পালন করে সমস্ত মানুষ যদি কর্তব্যনিষ্ঠ, নিয়মানুবর্তি সৎ ব্যবহার সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে ঐ সৎ গুণাবলীগুলি কি সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণে আসে না? যে ব্যক্তি রাজনৈতিক জীবনে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের ক্রীড়নক সেজে গোটা জাতিকে বিভিন্ন দেশের পদানত করতে চায়, সেই ব্যক্তি ধর্মপালন করে ব্যক্তি জীবনে কিভাবে দেশপ্রেমিক হতে পারে? যে ব্যক্তি চাকুরী জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, শিক্ষকতার জীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি চরিত্রহীন বলে পরিচিত হয় মানুষের কাছে, আর সেই ব্যক্তিকেই যদি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের আলখেল্লা পরে মসজিদেও দেখা যায়, তাহলে তাকে ধার্মিক না বলে ভন্ড কেন বলা হয়? বিড়াল তপস্বী উপাধি কেন পায়? রাজনৈতিক জীবনে যে ব্যক্তি দলীয় স্বার্থে বা ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে চরম

www.pathagar.com

মিথ্যাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে ঐ একই ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কি সত্যবাদী সাজতে পারে? ব্যক্তি জীবনে যে ব্যক্তি সন্ত্রাসী গুন্ডা, তিনি কি সমাজ জীবনে গিয়ে তার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেন? সুতরাং সমাজ জীবন থেকে ব্যক্তি জীবন পৃথক করে দেখার কোন অবকাশ নেই সমাজ বিজ্ঞানে। ধর্মের কারণে যদি ব্যক্তির নিকৃষ্ট চরিত্র পরিবর্তন হয়ে সৎ চরিত্র সম্পন্ন হয়, তাহলে ধর্মের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্রও পরিবর্তন হতে বাধ্য। কারণ ব্যক্তি দিয়েই সমাজ, আর সমাজ দিয়েই রাষ্ট্র। কোন ব্যক্তির চারিত্রিক দোষত্রুটি দূর করার জন্য যদি ধর্মের প্রয়োজন স্বীকৃত হয় তাহলে রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনৈতিক দল সমূহের দোষত্রুটি যথা সন্ত্রাসবাদ, মিথ্যাচারিতা, অসহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা, সাম্প্রসারণবাদের নির্লজ্জ দালালী দূর করতে ধর্মের প্রয়োজন কেন স্বীকৃত হবে না? ব্যক্তিগণ পৃথক পৃথকভাবে ধর্ম পালন করবে, আর দুই ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব স্বীকার করা চলবে না– এ কথা কি যুক্তিসংগত হতে পারে? ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ যুক্তির যে কোন মানদন্ডেই পরিত্যাজ্য এবং যুক্তিও বিবেক বহির্ভূত।

আল্লাহকে ব্যক্তি জীবনে আইন দেওয়ার অধিকারী, আর সমাজ রাষ্ট্র ও পরিবারের জন্য আইন দেওয়ার অধিকারী নয়, বলাটা চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক।

ধর্ম মানুষকে যে নৈতিকতার প্রশিক্ষণ দেয়, মানুষকে যে ভাবে নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে যে প্রক্রিয়ায় কলুষমুক্ত রাখতে চায়, ঐ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে ত্যাগের প্রয়োজন হয় বলেই নৈতিকতার বন্ধন গ্রহণ করে সমাজ রাষ্ট্র তথা সর্বস্তরে নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে, জীবন সম্পর্কে যারা অবাধ ভোগবাদে বিশ্বাসী তারাই এই ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারক বাহক। জীবনকে নীতিবোধের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ভাবে যাতে যা খুশী তাই করা যায়, এ সস্তা সুবিধা আদায় করার জন্যই এক শ্রেণীর নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তিরা ধর্মকে চিরতরে বিদায় করে দিয়ে সর্বস্তরে চরিত্রহীনতার প্লাবন বহায়ে দেওয়ার জন্যেই ধর্ম নিরপেক্ষতার আমদানী করে, তা প্রতিষ্ঠার জন্যই এরা দল গঠন করে দলের অন্যতম নীতি নির্ধারণ করে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ। কারণ অবাধে ভোগ করতে হলে, ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করা ছাড়া উপায় নেই। ধর্ম সামাজিক বা রাষ্ট্রিয় ব্যাপারে পরিণত হলে, অবাধে ভোগ করার চোরা গলি বন্ধ হয়ে যাবে (’), সুতরাং এ মতবাদের প্রবক্তাদের যে উদ্দেশ্য খারাপ, তা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার।

www.pathagar.com

এ জন্য ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা প্রকৃত ধর্ম তথা ইসলামকে উৎখাতের জন্য সরাসরি "ইসলামকে উৎখাত করবো বা ইসলাম পন্থীদের নির্মূল করবো" এ কথা ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা বলবে না। কারণ তারা জানে সরাসরি এ কথা বললে দেশের জনগণ ধর্ম নিরপেক্ষদের কবর রচিত করবে। তাই তারা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উৎখাতের নামে ইসলাম ও ইসলামপন্থিদের উৎখাত করতে চায়। মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটা দেশের সমস্ত জনগণ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না, কেননা দেশের অধিকাংশ জনগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে পিছিয়ে আছে। তাই ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা এ শব্দটা ব্যবহার করে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ইসলামকে উৎখাতের জন্য। মৌলবাদী বলতে বা ফান্ডামেন্টালিষ্ট বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যারা মূল জিনিষে বিশ্বাসী। মূল থেকে উৎপত্তি ঘটেছে যার, সেই বাদই হচ্ছে মৌলবাদ এবং যারা মূলে বিশ্বাসী তারাই মৌলবাদী (ফান্ডামেন্টালিষ্ট)।

ইসলামের মূল উৎসই আল কোরআন, যার প্রয়োগিক রূপ হচ্ছে সুন্নতে রছুলুল্লাহ (দঃ)। আর এই কোরআন হাদিসেই যাদের বিশ্বাস আছে, তারাই মৌলবাদী। কোরআন হাদিস তথা আল্লাহ ও তার নবীদের দেখানো পথ ছাড়া অন্য কোন পথ, মত মেনে নেয় না যারা, তারাই মৌলবাদী। যারা ইসলামের নামে কোরআন হাদিসকে বিকৃত করতে চায় না, কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন কানুনকে মেনে নিতে চায় না, যারা কোরআন হাদিসের আদর্শের কোন পরিবর্তন চায় না, যারা কোরআন হাদিস অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন, রাষ্ট্র জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত গড়তে চায়, কোরআন হাদিসকেই অনুসরণ করতে চায়, যে ইসলামের জন্য করুণার মূর্ত প্রতিক নবী মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ (দঃ) তার শরীর মোবারকের পবিত্র রক্ত দিয়ে ধরনীর বুক রঞ্জিত করে দিয়েছেন, দানদান মোবারক শহিদ করেছেন, সেই ইসলামকে যারা অকৃত্রিম ভাবে বুকে চেপে ধরে রাখতে চায়, তারাই মৌলবাদী। যে ইসলামের জন্য নবীর আদরের কন্যা মা ফাতেমা (রাঃ) দিনের পর দিন না খেয়ে অনাহারে থাকতে থাকতে শরীরটাকে কৃষ্ণকায় করে ফেলেছেন, সেই ইসলামের জন্য যারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারাই মৌলবাদী। যে ইসলামের জন্য শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম অবর্ণনীয় কষ্ট ও অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছেন এবং কোন কোন আলেমকে কারানির্যাতন

www.pathagar.com

মেনে নিতে হয়েছে, কোন পীরকে ফাঁসিকাষ্টে যেতে হয়েছে, কোন মাশায়েখকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে, কোন ইসলামী চিন্তাবিদকে জেলের অভ্যন্তরে তার পবিত্র দেহের উপরে ক্ষুধিত হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিয়েও যখন মুল ইসলাম থেকে এতটুকুন টলাতে পারেনি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা, তখন তাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যে মুল ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছেন, প্রতিটি ইসলামী চিন্তাবিদকেই যে মূল ইসলামের জন্য নির্যাতনের ষ্টীম রোলার সহ্য করতে হয়েছে, সেই মূল ইসলামেই যারা বিশ্বাস করে, তারাই মৌলবাদী মুসলমান। এ সমস্ত মুসলমান পত্র পল্লববাদী হতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এই মৌলবাদকেই উৎখাত করতে চায়। তারা এই মৌলবাদী মুসলমানদেরকেই নির্মূল করে, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন অবস্থা ও ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। ধর্মের শত্রু তথা ইসলামের চির দুশমনদের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ হতে হবে। নইলে ইমান আকিদা টিকিয়ে রাখা ইসলামে বিশ্বাসীদের পক্ষে তথা মুসলমান হিসাবে টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়বে। ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা নতুন কৌশলে যে ফাঁদ তৈরী করেছে, এ ফাঁদে পা দেওয়া আর ধ্বংসের অতলান্তে তলিয়ে যাওয়া একই কথা।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের অভিশাপ

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ মতবাদ কোন কল্যাণকর মতব্যদ নয়। এ মতবাদ মানব জাতির জন্য চরম অকল্যাণকর। এ মতবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ করার নামে, মানুষের জীবনের সর্বস্তর থেকে আল্লাহ ও রছুলের প্রভাব মুক্ত করে মানুষকে চরম হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করে, গোটা মানব জাতিকে আদর্শহীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা। মানুষকে ধর্মের প্রভাব মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করার পর কোন আদর্শের উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন পরিচালনা করবে, এ ধরনের কোন আদর্শের সন্ধান এ মতবাদে পাওয়া যায় না। জীবনের সকল বিভাগকে ধর্মীয় আদর্শ মুক্ত করে, মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন পশুর ন্যায় জীবন গ্রহণে বাধ্য করে এমতবাদ।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যহীনতা

মানুষ এমনি এক চারিত্রিক বৈশিষ্টতায় পরিপূর্ণ জীব যে, কোন কাজ করতে গেলে সর্বপ্রথম তাকে নির্ধারণ করে নিতে হয়, তার কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অন্য কোন জীবের ন্যায় এ মানুষ লক্ষ্যহীন কোন কাজ করতে পারে না। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গেলেই তার সামনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন আদর্শের দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী সে তার কাজগুলি সম্পাদন করবে? ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ মানুষকে কোন আদর্শের সন্ধান দেয় না বলে, মানুষ চরম হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন শূন্যতা। পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় চিন্তা ও চেতনার শূন্যতা নিয়ে, মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না বলে সে, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য আদর্শের সন্ধানে অস্থির হয়ে উঠে। ফলে চিন্তা ও চেতনার জগতের শূন্যতা পূরণ করার জন্য তার সামনে বিচিত্র ও মানব চিন্তার বিপরীতমুখী আদর্শের সমাবেশ ঘটতে থাকে।

এমতাবস্থায় মানুষের যে, কি করুণ পরিণতি ঘটে তা এক উদাহরণের মাধ্যমে পরিস্কার হতে পারে। কোন একব্যক্তির অনেক বন্ধু ছিল। কোন বন্ধু ছিল শুকনা কাঠ ব্যবসায়ী, কোন বন্ধু ছিল তুলা ব্যবসায়ী, কোন বন্ধু ছিল কাপড় ব্যবসায়ী, কোন বন্ধু ছিল কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ী, কোন বন্ধু ছিল ডিজেল ও পেট্রোল ব্যবসায়ী। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, গভীর রজনীতে গোটা পৃথিবী যখন সুসুপ্তিতে নিমগ্ন তখন ঐ অনেকগুলি বন্ধুর অধিকারী ব্যক্তিটির আপন বাসগৃহে আগুন লেগেছে। তখন ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে তার বন্ধুদের বলছে, আমার এই চরম বিপদের মুহূর্তে তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে এসে আমাকে সাহায্য কর। লোকটির করুণ আর্তনাদে সাড়া দিয়ে তার সমস্ত বন্ধুরা এগিয়ে এলো। শুকনো কাট ব্যবসায়ী বন্ধু, শুকনো কাঠ নিয়ে এসে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। কাপড় ব্যবসায়ী বন্ধু এসে আগুনের মধ্যে কাপড় ফেলে দিল, খড় ব্যবসায়ী বন্ধু এসে আগুনের মধ্যে খড় ফেলে দিল, কেরোসিন ব্যবসায়ী বন্ধু এসে কেরোসিন ঢেলে দিল আগুনের মধ্যে, ডিজেল ও প্রেট্রোল ব্যবসায়ী বনধু এসে আগুনের মধ্যে ডিজেল ও পেট্রোল ঢেলে দিল। সব বন্ধুরই কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে সাহায্য করা অর্থাৎ বন্ধুর ঘরের আগুন নির্বাপিত করা। পক্ষান্তরে বিপদগ্রস্ত বন্ধুর জন্যএই ব্যক্তিগুলি যা করলো, তাতে করে বিপদ গ্রস্ত বন্ধুর বিপদ বাড়ল বৈ কমলো না।

www.pathagar.com

ঠিক তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, তখন মানুষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিরাজ করতে থাকে এক চরম অরাজকতা। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে মানুষের চরম বিপদের সময়ে ভোগবাদে বিশ্বাসী ধূর্ত ব্যক্তিরা, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর মতবাদ মতাদর্শ তৈরী করে মানুষের সামনে পেশ করে মানব জাতির সীমাহীন সমস্যা সমাধানের জন্যপরামর্শ দেয়। আদর্শ শূন্য হতাশাগ্রস্ত মানুষ এ সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করার ফলে, সমস্যা আরও বৃদ্ধিই পেতে থাকে। মরুসাইমুম তাড়িত পিপার্সিত পথিকের এক চুমক পানি যেমন তৃষ্ণা বৃদ্ধিই করে চলে, ঠিক তেমনি একটির পর একটি ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করার ফলে মানব জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। ধর্ম নিরপেক্ষতা মানুষকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন করে আদর্শিক শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করার কারণে মানব জীবন হয় অশান্ত অস্থির। আর এ সবকিছুই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ নামক বিষবৃক্ষের ফল।

নৈতিকতার অবক্ষয়

মানুষ মাত্রই নৈতিক জীব। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষ মেনে চলে বলেই অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষ উন্নত মর্যাদার অধিকারী। নৈতিক মূল্যবোধে যদি কোন মানুষ উন্নত না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি সমাজের চোখে ঘৃণিত এক পশুর ন্যায় হয়ে পড়ে। আইন ও শাসন মানুষের মধ্যে প্রকাশ্য নৈতিকতা কিছুটা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও, মানুষের মনে নৈতিকতা বোধ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মানুষের মন কালিমা মুক্ত হয় না, মানুষের মন থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর হয় না। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মানুষ সুযোগ পেলেই অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একবার ক্ষণিকের জন্য ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, যতক্ষণ ইলেকট্রিসিটি ছিল না নিউইয়র্ক শহরে, এই সময়ের মধ্যে এমন কোন দুষ্কর্ম ছিল না, যা সেখানে ঘটেনি। মানুষের মধ্যে অপরাধ থেকে বিরত থাকার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে শুধু মাত্র ধর্ম। অর্থাৎ এমন এক স্রষ্টার প্রতি মানুষের বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন, যে স্রষ্টা মানুষের প্রকাশ্য, গোপনীয় তথা সকল কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। যিনি মৃত্যুর পর আদালতে আখেরাতে, মানুষের এই পৃথিবীতে কাজ কর্মের ধরন অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

www.pathagar.com

আইন মানুষের কর্ম জীবনকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। ইচ্ছা শক্তির উপরে আইন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু ধর্ম ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। নির্জনে একাকী অবস্থায় দুনিয়ার কোন আইন মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না।

পক্ষান্তরে ধর্মমানুষকে যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায় অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে। তাই ধর্মই মানুষের কর্ম জীবনকে পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষকে আদর্শ মানবে পরিণত করে। নৈতিক চরিত্র বর্জিত মানুষকে, মনুষ্যচর্মাবৃত পশুই বলা চলে। এমন কি জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির অধিকারী মানুষ চরিত্রহীন হলে, পশুত্বকেও হার মানায়।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ মানুষকে পশুত্বের শেষ স্তরে নিক্ষেপ করে। এ মতবাদ মানবদেহের সুপ্ত পশুত্বকে বল্গাহীন করে, নৈতিকতার শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন করারই জঘন্য আদর্শ মাত্র। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ যে ধরনের সভ্যতার জন্ম দিয়েছে,তা নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানব সমাজের উপযোগী নয়। মানুষের মধ্যে মানবতা বোধ জাগ্রত করার মাধ্যমই হলো ধর্মীয় অনুভূতি। মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করে বটে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ভালমন্দের ব্যবধান করার ধারণা ধর্মই দান করে। নৈতিকতার বিধান সমূহ একমাত্র ধর্মেরই অবদান। মানুষের জীবনে নৈতিক অনুশাসন কার্যকরী করে সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়তে হলে, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ মানুষের মধ্য থেকে নৈতিক মূল্যবোধ বিদায় করে দেয়। পক্ষান্তরে নৈতিক মূল্যবোধই মানুষের জীবনকে সত্য সুন্দর ও কৃষ্টি সম্মত করে গড়ে তোলে। সভ্যতা অসভ্যতা, ভুল নির্ভুল, ন্যায় অন্যায়ের নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছবার দায়িত্ব যদি প্রত্যেক মানুষের যুক্তির উপর ন্যাস্ত থাকে, তা হলে বিশ্বের মানুষ কোন চিরন্তন ও শ্বাসত মূল্যাবোধের সন্ধান পাবে না। মানব জাতির যিনি স্রষ্টা, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব চিরন্তন মূল্যবোধ দেওয়া, একই সংগে দুটি পরস্পর বিপরীত জিনিষ সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না, অথচ মানুষ নিজের বুদ্ধি সর্বস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে পরস্পর দুটি মূল্যবোধ নির্ধারণ করে। মাদকাশক্ত হওয়া কেউ ভাল মনে করে, আবার কেউ খারাপ মনে করেন। প্রত্যেক বস্তুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভালমন্দ এবং আদি অন্ত, সম্পর্কে যার নির্ভুল জ্ঞান আছে, তার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর না করে, মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোন কিছুর সঠিক মূল্যমান নির্ধারণ করতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষতা অনুযায়ী, "মূল্য নির্ধারনের দায়িত্ব মানুষের"। মানুষ যখন নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন আজ যা সঠিক সিদ্ধান্ত, কাল তা ভুল বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য হয়। আমেরিকার আইন সভায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের শাসনামলে মদ্য পানের উপরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সরকারী ঘোষণায় মদ্যপান অবৈধ করা হয়। সামান্য কিছুদিন পরেই আবার ঐ একই আইন সভায় মদ্যপান বৈধ বলে ফতোয়া দেওয়া হয়। এখানে দেখা গেল, এ দুই বিপরীতমুখী সিদ্ধান্তের কারণে মদের মূল্যমান কিন্তু একই ছিল।

সুতরাং মানুষ সঠিক মূল্যমান নিরুপনে ভুল করতে পারে। পক্ষান্তরে মূল্যমান কখনও পরিবর্তন হয় না। মূল্যমান নিরূপণ করে দেয় স্রষ্টার দেওয়া বিধান তথা ধর্ম। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করে ধর্মের সমস্ত প্রভাব জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে বিদায় করে দিলে মূল্যমান নির্ধারণ করবে কে? নির্ভুল মূল্যমান নিরূপণ করতে ব্যর্থ হলে, মানব জাতির অবস্থা কোন স্তরে গিয়ে পৌছে তা আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ জাতি সমুহের মানবতা বোধের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সহজে অনুমান করা যায়।

ধর্ম নিরক্ষেতাবার্দ মানুষকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে। এ মতবাদের প্রভাবে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় সুবিধাবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সহ নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রবণতা জন্ম নেয়। এর ফলে আধুনিক মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান স্বার্থপর মানুষের হাতে পড়ে মানব জাতির কল্যাণের পথে যতটা ব্যবহার হচ্ছে, তার চেয়ে বেশী ব্যবহার হচ্ছে অকল্যাণের পথে। ধর্ম নিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মকে বিদায় করে দেবার প্রবণতা, মানব জাতিকে ধংসের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ধর্ম নিরপেক্ষ শাসকের অবস্থা

রাষ্টশক্তি এক যন্ত্র, যা দিয়ে জনগণকে চরম শাস্তি দেওয়া যায়, আবার নিষ্ঠুর নির্যাতনও করা যায়। জনগণের কল্যাণ অকল্যাণের যাবতীয় চাবিকাঠি থাকে রাষ্ট্রের হাতে। জাতীয় উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা, জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা সহ সব কিছু প্রণয়ন করে রাষ্ট্র। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট নির্ভর করে রাষ্ট্রের শিক্ষা নীতি প্রণয়নের উপরে। রাষ্ট্রের পরিচালিত বিচার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে নাগরিকদের জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তা। রাষ্ট্রের প্রচার

www.pathagar.com

মাধ্যমের উপরে নির্ভর করে জনগণের আকিদা বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের শাসক যদি আল্লাহর দাসত্ব ও ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, আদালতে আখেরাতে আল্লাহর কাছে জওয়াব দিহির অনুবুতি যদি শাসক গোষ্ঠির মনের মধ্যে না থাকে, তাহলে ঐ ধর্ম নিরপেক্ষ নাস্তিক শাসক দেশের জনগণের কল্যাণ ও অকল্যাণের চিন্তা না করে দলীয় সুবিধার নীতিই অবলম্বন করবে। এ ধরনের শাসক গোষ্ঠির চরিত্র কিছুতেই সন্দেহের উর্ধে হতে পারে না। এরা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ রক্ষার জন্য যা খুশী তাই করতে পারে। গদি রক্ষার জন্য ধর্মভীরু জনগণকে ধোকা দিয়ে ধর্মকেও পর্যন্ত ব্যবহার করে এরা। ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে টিকে থাকার জন্য এ ধরনের চরিত্রহীন শাসকরা যে কোন ধরনের পথ অবলম্বরন করতে মোটেও দ্বিধা করে না। রাষ্ট্রীয় তহবিল এরা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে। স্বজনপ্রীতি চালু করে গোটা দেশে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। ধর্মের দেওয়া কাঠামো অনুযায়ী যে শাসকবৃন্দ নিজেদের চরত্রি গঠন করে না,তারা স্বাভাবিক কারণেই নির্লজ্জভাবে মিথ্যাচার প্রচার করতে থাকে। দেশের জনগণের রায় না পেয়েও জাতীয় প্রচার মাধ্যমেও প্রশাসনকে নিজের পক্ষে মিথ্যা সাফাই গাওয়াতে এ ধরনের চরিত্রহীন শাসকরা বাধ্য করে। ক্ষমতায় থাকার পথকে নিষ্কণ্ঠক করার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরূপ করে, কোন কোন বিরোধীদলকে ক্রয় করে এক দলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে দেশব্যাপী হানাহানীর সৃষ্টি করে, দেশের সমস্যাকে জনগনের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার অপচেষ্টা করে। রাষ্টীয় সম্পদকে নিজের পৈতৃক সম্পদ মনে করে জনগণের অধিকারে নির্লজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করে। নিজেরা নিরাপদে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন পর্যন্ত পরিবর্তন করে। ধর্মীয় অনুভূতি শূন্য শাসকবৃন্দ দেশের শতকোটি জনতাকে বুভুক্ষ রেখে, জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্রতাকে দুর না করে, বিলাস সামগ্রী তৈরীতে ব্যস্ত থাকে। পরকালে জওয়াবদিহি করার চিন্তা না থাকার কারণে, এ ধরনের শাসক গোষ্ঠী জাতীয় স্বার্থ পর্যন্ত জলাঞ্জলী দিতে কসুর করে না। ধর্মের প্রতি উদাসীন হওয়ার কারণে এরা সহজেই আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক বনে দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত বিদেশের কাছে বন্ধক দেয়। ধর্ম নিরপেক্ষ শাসকবৃন্দ, সম্প্রসারণবাদী শক্তির হাতের পুতুল হয় বলে, প্রভুর মনোরঞ্জন করার জন্য জাতীর পরিচয় পর্যন্ত মুছে দিয়ে গোটা জাতিকে আগ্রাসী শক্তির পদানত হতে সাহায্য করে।

বিশ্বের মানচিত্রে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, ইসলামী আদর্শ ব্যক্তি ও সমষ্টি

www.pathagar.com

জীবনে সফল রূপায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, অবিভক্ত ভারতের দশকোটী মুসলমান আশা করেছিল যে, আল কোরআন ও সুন্নাহর উজ্জল আলোকে তাদের জীবন পরিক্রমা শুরু হবে নব আযাদীলব্ধ এ নতুন রাষ্ট্রে। ভাষা বর্ণ আঞ্চলিকতার আত্মঘাতী প্রভাবের ঐন্দ্রজালিক মায়া কাটিয়ে , এ জাতি তার মনজিলে মকসুদের দিকে দৃঢ় প্রত্যয়ে কদম বাড়াবে, এ আশা আর স্বপ্ন সাধ ছিল তখন অযুত মানুষের মনে। কিন্তু সে সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী শাসকবৃন্দের কুট কৌশলে। ইসলামী জাতীয়তার উদ্বোধনের পথে সকল দিক থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারক বাহকরা সৃষ্টি করেছিল বাধার বিন্ধাচল। অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা আর ভাষাগত বিরোধের গোড়ায় পানিঢেলে।

পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেবার চক্রান্ত চালিয়ে ছিল এই ধর্ম নিরপেক্ষ নাস্তিকরা। যখন জালিম শাসক আইউব শাহীর বিরুদ্ধে গোটা দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল গণ আন্দোলন, সে আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে, মুসলিম জাতীয়তা মুছে ফেলে তথাকথিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, এ জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সাথে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর, এ জাতি বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম দিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ আশাতেই যে, তারা এদেশে নিজ আশা–আকাংখা বাস্তবায়িত করবে।

কিন্তু ধর্ম নিরক্ষেতাবাদের মানষপুত্রেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধোয়া তুলে, এ জাতির জাতীয় পরিচয় পর্যন্ত সম্প্রসারণবাদী শক্তির কাছে বিকিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেনি। ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই পেড়ে পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আমদানী করে, ইসলামে বিশ্বাসী মুসলমানদের মুখ থেকে তারা কেড়ে নিয়েছিল, "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার" ধ্বনি। জিন্দাবাদের বদলে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা আমদানী করল "জয় বাংলা"। আবহমানকাল থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত "জয় মা কালী", ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা মুসলিম যুবকদের মুখে তুলে দিয়েছিল সেই জয় ধ্বনি। মুসলমানদের মুখ দিয়ে পুরো হিন্দুয়ানী কায়দায় উচ্চারণ করালো, "ওমা তোর চরণ তলে ঠেকাই মাথা," মুসলমানদের এ মাথা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে নত হয় না। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা সে মাথা দেশের চরনে ঠেকিয়ে দিয়েছিল। ধর্ম নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে সংবিধানের উপর থেকে

www.pathagar.com

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" তুলে তো দিয়েই ছিল, বাংলাতেও এ কথাটি স্থান পেলো না যে, "দয়াময় স্রষ্টার নামে আরম্ভ করছি"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরআনের সমস্ত আয়াতগুলি বাদ দিয়ে দেয়া হলো। স্বাধীনতার জন্য বীর দর্পে লড়াই করে যে, তিতুমীর শাহাদত বরণ করলেন, তার নাম মুছে দিয়ে কঠোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী সূর্য্য সেনকে বানানো হলো জাতীয় হীরো। অথচ সূর্য্য সেন কোনদিন কোন মুসলমানকে ভাল নজরে দেখেনি এবং তার দলে কোন মুসলমানকে প্রবেশ করতেও দেয়নি।

এই তথ্যকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা কবি নজরুল ইসলামের ভালো ভালো গজল কবিতা বাদ দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিন্দু ভাবাপন্ন সংগীতটিকেই দেয়া হলো জাতীয় সংগীতের মর্যাদা। দেশের সংবিধানটিকে সম্পূর্ণ আল্লাহ ও রাছুল (দঃ) এর নাম বর্জিত করে রচনা করা হলো। ছাত্রাবাস ও শিক্ষাগারগুলো থেকে ইসলাম ও মুসলমান শব্দ ঝেটিয়ে বিদায় করা হলো। ফজলুল হক মুসলিম হল ও স্যার সলিমুল্যাহ মুসলিম হলগুলো থেকে মুসলিম শব্দটি কেটে দেওয়া হলো। ইসলামীক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম বদলে কবি নজরুল কলেজ রাখা হলো, এখানেও নজরুল ইসলামের "ইসলাম" শব্দটি বাদ গেল। পশু সম্পদ রক্ষার নামে গরু কোরবানী বন্ধ ও 'বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের নামে হজ্বযাত্রী কমানোর সুপারিশ করা হলো। গোটা দেশের পীর মাশায়েখ, আলেম ওলামাদের দিয়ে (কোলাবরেট এ্যাক্ট এর নামে) কারাগারগুলি পরিপূর্ণ করা হলো। ধর্মীয় শিক্ষালয় মাদ্রাসাগুলি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করা হলো। ধর্মীয় অনুষ্ঠান যাতে না হতে পারে সে ষড়যন্ত্রও চললো। এ সময়ে দাউদ হায়দার নামে নরকের এক কীট মহানবী (দঃ)কে "তুখোর বদমায়েশ" নামে গালী দিয়ে কবিতা রচনা করলো। মুসলমানদের রুদ্রুরোষ থেকে তাকে আবার বাঁচানোর জন্য, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা তাকে প্রভুর দেশে পাঠিয়ে দিল। এ সব কিছু হয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতার নাম ভাঙ্গিয়েই।

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস যাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের শাসন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ নাস্তিকদের শাসনে যে, আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকে, তা যেমন যুক্তিসংগত তেমনি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। যারা ধর্মকে বাস্তবজীবনে গ্রহণ করেছে তাদের শাসন আর ধর্মহীনদের শাসন স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন ধরনের হবে। এমনকি মুসলিম শাসকদের দীর্ঘ শাসন আমলে ধার্মিক ও অধার্মিক শাসকদের যুগে সাধারণ জনগণের জীবনে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়

www.pathagar.com

ইতিহাসে।

শাসন শক্তি সমাজের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সবল শক্তি। এ বিপুল শক্তিকে যথেচ্ছা ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারে, আল্লাহ ও পরকালের ভয় তথা ধর্ম। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ শাসকবৃন্দ নিজেদের কলুষতা ঢাকা দেওয়ার জন্য প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে জনমতকে বিভ্রান্ত করে অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দেয়। ধর্ম নিরপেক্ষতা মানুষের মধ্যে নাস্তিকতা জন্ম দেয়। কেননা স্রষ্টা নামক যে সত্তাকে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করে শুধু ধর্মীয় উপসনালয়ে বন্দি করা হয়, সে সত্তার পক্ষে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয় না। আর চার দেয়ালে বন্দি কোন দুর্বল সত্তার প্রতি মানুষের মনে শ্রদ্ধা না এসে, ঘৃনা ও অবহেলা আসাটাই স্বাভাবিক। গোটা পৃথিবী জুড়ে যখন অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে, অগনিত সমস্যার কারণে মানুষের জীবন যখন জর্জরিত, মুক্তির সন্ধানে মানুষ যখন পাগল পারা, তখন স্রষ্টা যদি জীবন সমস্যার সমাধান না দিয়ে শুধু পরকালের ভয় দেখান, তাহলে মানুষ সে ধরনের স্রষ্টাকে মসজিদে গিয়েও মানবে কি? যে ভগবান মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সংকুল অবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখায় না, সে ভগবান শুধু মন্দিরে বসে পূজা দাবী করবে, আর মানুষ তাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করবে, এটা কোন যুক্তিকতার কথা? যে গড সপ্তাহ ব্যাপী গীর্জায় বসে সুসুপ্তিতে নিমগ্ন থাকবে, আর তার অনুসারীরা এই ঝন্‌ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে অসহায়ের মত পড়ে থাকবে,আর রবিবার এলেই তিনি তার আনুগত্য করার দাবী জানাবেন, তখন মানুষ স্বাভাবিক কারণেই তার আনুগত্যের দাবী প্রত্যাখান করবে।

ধর্ম নিরপেক্ষতা স্রষ্টাকে ক্ষমতাহীন করতে চায়। ফলে মানুষ নিষ্কর্মা দুর্বল স্বার্থপর ও অনাবশ্যক, স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে। পরিশেষে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ মানুষকে নাস্তিকতার দিকেই পরিচালনা করে। ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদীরা খোদাকে মসজিদের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে, নিজেরাই জনগণের খোদা বনে যায়। নিজেরাই আইন কানুন তৈরি করে খোদার স্থান দখল করতে চায়। মানুষের পক্ষে যেহেতু ইনসাফপূর্ণ বিধান তৈরি করা সম্ভব নয়, সেহেতু ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে, স্রষ্টার দেওয়া ইনসাফপূর্ণ বিধান জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার আন্দেলনে অংশগ্রহণ করাই মানুষের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তির পথ সুগম করবে।

www.pathagar.com

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের চূড়ান্ত পরিণতি

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিপুল পরিসর ক্ষেত্র থেকে, ধর্ম তথা খোদাকে নির্বাসিত করা এবং এই ক্ষেত্রে খোদার প্রভুত্ব ও তার বিধিমালা মেনে না চলাকেই আধুনিক পরিভাষায় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বলে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ মূলতঃ কোন আদর্শের নাম নয়। বরং এ মতবাদ আদর্শের অস্বীকারকারী। যদিও বর্তমান দুনিয়াতে অনেক দেশেই এই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকে একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও এ কথা বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে প্রমাণিত সত্য যে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ কোন আদর্শ নয়।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তি হয়েছে ইউরোপের ধর্মদ্রোহী মনোভাব থেকে। ইউরোপে খৃষ্টান পাদ্রীদের অনুশাসনের বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত সমাজের মনে চিন্তার এক প্রলয়ংকর তান্ডবের সৃষ্টি হয়। কারণ, সেন্ট পলের যুগ থেকেই হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত আদর্শ সংকীর্ণ ধর্ম মত হিসাবে প্রচারিত হতে থাকে। যা মানুষের ব্যক্তি জীবনে শুধু অনুসরণযোগ্য কিছু সংখ্যক নৈতিক উপদেশ পেশ করতে পারতো বটে, কিন্তু মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে কোন বিধানই পেশ করতে অক্ষম ছিল। অথচ তখনকার সমাজের বিপুল সম্প্রসারণশীল ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, এমন একটি ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল, যা মানব সমাজের সর্বদিকের জন্য সমভাবে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দান করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু সেন্টপল রচিত খৃষ্টান ধর্ম নব্য শিক্ষিত লোকদের মনের আধুনিকতম জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিতে সমর্থ ছিল না। ফলে খৃষ্টান পাদ্রীগণ এই সব ক্ষেত্রে হয় মনগড়া কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করত, না হয় নব্য শিক্ষিতদের মনের আধুনিকতম জিজ্ঞাসাকে অবদমিত করার জন্য প্রচন্ড দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতো। এর ফলে শিক্ষিত জনগণ রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে, প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে প্রোটেষ্টান্ট ধর্মমতের ভিত্তি স্থাপিত করে। ইউরোপের এই চিন্তা জগতের বিপর্যয়ের দুইটি বিরাট পরিণতি দেখা দেয়।

প্রথমতঃ– সমস্ত ল্যাটিন ইউরোপ প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এই পরস্পর বিরোধী ধর্ম মতের ধারক হওয়ার কারণে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ধর্ম রক্ষার নামে দীর্ঘ মেয়াদী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আর দ্বিতীয়তঃ চার্চ ও রাষ্ট্র সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চার্চ ও রাষ্ট্র সরকারের এই বিচ্ছেদের প্রভাব উভয় গোষ্ঠীর উপর সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলনে প্রভাবান্বিত এলাকায়, রোমের পোপ তন্ত্র সমস্ত প্রভাব হারিয়ে ফেলে। আর যে এলাকায় রোমান চার্চের প্রভাব ছিল, সেখানে এক "অচল মুদ্রা" হিসাবে ধর্ম টিকে থাকে। কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে শিক্ষিত লোকদের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতিক্রিয়া এখানেই শেষ হয়ে গেল না। এর পর প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত ইউরোপে নিছক আবেগ উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতার ভিত্তিতে ধর্ম বিরোধীতার এক প্রচন্ড অন্ধ অভিযান চলে। এই সময়ে চিন্তার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়, তারা সবাই ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রচারণা চালায় এবং সমাজ-মনকে ধর্ম বিরোধী ভাবধারায় বিষাক্ত করে তোলে। ইংল্যান্ডে হবস, লক ও ফ্রান্সের ভলটেয়ার, রুশো ও মনেট্স্কো প্রমুখ চিন্তাবিদগণ এমন এক চিন্তাবাদের জন্ম দেন, যাতে ধর্ম ও রাজতন্ত্রের উভয়ই সমানভাবে উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত হয়। এর পরে ইউরোপে আরও অনেক চিন্তাশীলের জন্ম হয়। যাদের সবাই নিতান্তই আক্রোশ বশতঃ ধর্মের উপর আঘাত হানাকেই চিন্তার বিষয়বস্তু ও জীবনের একমাত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে।

এর অনিবার্য্য ফলশ্রুতিতে ডারউইনবাদ ও সমাজতন্ত্র নামে তখনকার সময়ে এমন দুইটি মতবাদ জন্ম নেয়, যা প্রথমটি স্রষ্টার অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করে, আর দ্বিতীয়টি স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানব জাতীর জন্য কোন জীবন বিধান অবতীর্ণ হওয়াকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

তখন বস্তুবাদই যাবতীয় চিন্তা গবেষণার মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অতীত কোন জিনিষকেই কেউ মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ইংল্যান্ডে গ্লোরিওয়াস রেভুলেশন এই ধর্ম বিরোধী মনোভাবকে অধিকতর শক্তিশালী করে দেয়। ধর্মকে অস্বীকার করার মত মনোভাব সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের উপর সর্বাত্বক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মানুষের মন থেকে ধর্ম ও খোদার প্রতি বিশ্বাসের শেষ চিহ্নটুকু অপসৃত হয়। এই ধর্ম বিরোধী প্রবণতা উনবিংশ শতাব্দীতে দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় অগ্রসর হতে শুরু করে। একটি দল ধর্মকে শুধু পরাজিত ও অধিন্যস্ত করেই ক্ষান্ত হয়ে এবং সমাজ জীবন থেকে ধর্মকে বিতাড়িত করে, ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ করে সন্তুষ্ট ছিল না, বরং তারা ব্যক্তি জীবনের দূরবর্তী কোন্ থেকেও ধর্মের ক্ষীণতম প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মানুষের চিন্তার জগতকে স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাসী ও তীব্র

www.pathagar.com

বিরোধী করে তোলার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। বস্তুততঃ ধর্মের বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক সংগ্রাম ঘোষণা করা এবং ব্যক্তি ও সমাজকে ধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে বস্তুবাদ ও বস্তুবাদের সর্বাত্মক ধারণার অধীন করে দেওয়াই ছিল এর অভিষ্ট লক্ষ্য। তাদের ধারণা ছিল এই যে, মানুষের জীবনে ধর্মের ক্ষীণতম প্রভাবও অবশিষ্ট থাকলে মানুষ কখনও সুস্থ ও শক্তিশালী হতে পারবে না। ধর্ম তাত্ত্বিক ও মনোস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এই দলের নেতৃত্বে ছিল গাফলুক, ডষ্টর ওয়াটসন, গেষ্টাউলট ও ফয়ের বা খের হাতে। এবং রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ছিল কার্লমার্কস ও এঞ্জেলস এর হাতে। এরা সবাই প্রচন্ড ও আক্রমণাত্মক বস্তুবাদে বিশ্বাসী।

দ্বিতীয় দলঃ যারা তখন বিভিন্ন দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, তারা এই ধারণা পোষণ করত যে, ধর্মের উপর কোন সম্মুখ আক্রমণ করার প্রয়োজন নেই। ধর্মকে শুধু ক্ষমতার আসন থেকে বিদায় করতে পারলেই ধর্ম ধীরে ধীরে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হতে বাধ্য। তাদের মতে মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কোন একটি ক্ষেত্রেও ধর্মকে একবিন্দু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে না। অবশ্য মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে একটি ক্ষীণতম সম্পর্ক যদি থেকেই থাকে, তাহলে কোন আপত্তি করা উচিত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তি জীবনের সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে কেউ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইলে তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা নেই। কেননা সমাজ জীবন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করলে, ধর্মহীনতার উপর সমাজ একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে "ধর্ম" ধীরে ধীরে ঘরোয়া পরিবেশেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য। কারণ জীবনের বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে জনগণ যখন সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে যাবে, তখন একদিন না একদিন মানুষ ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরেও ধর্মের ব্যবহারিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যদি ধর্ম সম্পর্কে কোন আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তা হলে ধর্মের প্রতি মানুষের জন্মগত প্রবণতা তীব্র হয়ে উঠবে।

ধর্মের বিরুদ্ধে এই অভিনব ও বৈজ্ঞানিক (?) চিন্তা পদ্ধতি এবং কর্মনীতির পরিভাষিক নামই হচ্ছে ধর্মহীনতা বাদ। ১৮৩২ সনে এটা একটি পরিপূর্ণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। জেকব হোলেক, চালর্স সাউথ ওয়েল, থামস কুপার, থামস টিয়ার্সন ও স্যার ব্রেডলে প্রমুখ চিন্তা নায়করা এই দৃষ্টিভংগির অগ্রনায়ক। বস্তুবাদ ও ধর্ম বিরোধী মনোভাবের প্রথমোল্লেখিত দৃষ্টিভংগী

www.pathagar.com

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখান থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অকমিউনিষ্ট দেশে কমিউনিষ্টরা এই ধরনের ঘৃণ্য মনোভাব নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আর শেষোক্ত দৃষ্টিভংগী বর্তমানে সর্বত্র সমাজ রাষ্ট্রে ও ব্যক্তি জীবন–জীবনের সর্বস্তরে দৃঢ়তা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহীতার এই আন্দোলন, দুইটি কর্মনীতি ও কার্যসূচীর দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী হলেও উভয়ের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন এবং পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে অসংখ্য দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হলেও এরা চিরদিনই পরস্পরের সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজ করে, বর্তমানে তা এক চরম সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও ইসলামকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে অভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে এরা মাঠে নামে।

বর্তমানে এই বাংলাদেশেই, কোরআন তাফসীর মাহফিল বন্ধসহ ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ঘটনাবলী তার উজ্জল প্রমাণ। ধর্মহীন এই দুই গোষ্ঠির একটির দ্বারা অপরটির উন্নতি বিধান ও একটির গর্ভ হতে অপরটির আত্মপ্রকাশ এক প্রকার স্বাভাবিক ব্যাপার হয়েই দাঁড়ায়। ধর্ম বিরোধী মনোভাব থেকে উৎসারিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই আন্দোলন দুইটির যে তত্ত্বমূলক ও ঐতিহাসিক আলোচনা এই বক্ষমান নিবন্ধে করা হলো, তা খুবই শিক্ষামূলক। এই আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সামজতন্ত্র এই দুইটি মতবাদই চরম ধর্ম বিরোধী তথা বস্তুবাদী মনোভাব থেকে উদ্ভুত হয়েছে। তবুও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ও নাস্তিক সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যে, সময় সময় দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়, আবার কখনও চরম বন্ধুসুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়, তার রহস্যও এই আলোচনা থেকে উদঘাটিত হয়ে যায়। ইউরোপের জনগণের উপর ধর্ম নিরপেক্ষতার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা এর ঐতিহাসিক পটভূমি অপেক্ষাও অধিকতর সাংঘর্ষিক ও মর্মান্তিক। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের দৃষ্টিভংগী যারাই গ্রহণ করেছে, তাদের সকলেরই চিন্তার স্থিরতা ও আদর্শের নিশ্চয়তা থেকে মর্মান্তিকভাবে বঞ্চিত হতে হয়েছে। তারা কোন একটি নীতির উপরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে। ফলে আজ যে, নীতিকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছে, আগামীকাল আবার ঐ নীতিকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অভিহিত করে এবং ঐ নীতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরোধীতা করতে মোটেও কুন্ঠিত হচ্ছে না। বর্তমানে এর

www.pathagar.com

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কমিউনিস্ট দেশগুলি। এদের দৃষ্টিতে চিরন্তন সত্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সত্য ন্যায় নীতি ও ইনসাফ সবই এদের দৃষ্টিতে আপেক্ষিক। এই ধর্ম নিরপেক্ষতা গ্রহণের ফলে, ধর্ম নিরপেক্ষ প্রতিটি মানুষ চরম স্বার্থপরতা ও নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এ মতবাদ একদিকে চিন্তার স্বাধীনতার নামে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত লোভলালসার জন্ম দিয়েছে, আর অপরদিকে জাতীয় স্বকীয়তার নামে অন্ধ জাতিপূজারী সৃষ্টি করেছে। এর ফলশ্রুতিতে এক একটি দেশের জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব, হিংস্র দলবাদ, ব্যক্তিত্বের পূজা ও ক্ষমতার উপাসনা ইত্যাদি প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে উপনিবেশবাদ তথা সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করে, দুর্বল দেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করার জন্য প্রচন্ড প্রতিযোগিতা, নতুন নতুন বাজার ও ব্যবসার কেন্দ্র দখল এবং সংখ্যালঘু ও পৃথিবীর দুর্বল পশ্চাদবর্তী অনুন্নত জাতিগুলির ঘর উজাড় করে তাদের স্বাধীনতা হরণ করার ব্যাপারে অমানবিক প্রতিযোগিতা ও কাড়াকাড়ীর জন্ম দিয়েছে। এরই ফলে পৃথিবীর মানুষেরা দুই দুইটি প্রলয়ংকরী মহাযুদ্ধের বিভিষিকা অবলোকন করে তৃতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতার আশংকায় শংকার মধ্যে প্রহরকাটাচ্ছে।

এই নাস্তিক্য মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার অধীন "জাতীয় রাজতন্ত্রের" পরিবর্তে জাতীয় গণতন্ত্রই হয় রাষ্ট্র সরকারের রূপ তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব নামে পরিচিতি লাভ করে। অর্থাৎ জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে কিছু সংখ্যক লোক জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা ও ভাগ্য নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। যা ইসলামের দৃষ্টিতে শির্ক ও কুফর, তথা আল্লাহর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ।

কারণ পাশ্চাত্যের খোদাহীন ভোগবাদী গণতন্ত্র অনুযায়ী মানুষ নিজেই আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। এই বস্তুবাদী গণতন্ত্র, স্রষ্টার দেওয়া আইনের প্রয়োজন নেই বলে ধারণা দেয়, পক্ষান্তরে ইসলাম বলে, আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, এ কথা কোরানে বার বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে।

পশ্চিমা বস্তুবাদী গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে একশ্রেণীর ভোগবাদীরা ধাপ্পাবাজি করে ক্ষমতায় গিয়ে গুটি কয়েক সবল মানুষ অগণিত দুর্বল মানুষের প্রভু তথা খোদা হয়ে দাঁড়ায়। আর ইসলাম গণতন্ত্রের যে ধারণা

www.pathagar.com

দেয় তাহলো, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। পৃথিবীর বুকে মানুষ আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবে মাত্র। ইসলামী দলে বা রাষ্ট্রে, দলের অথবা রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ দলীয় কর্মী বা দেশের আপামর জনগণের কাছে তাদের যাবতীয় কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে বাধ্য। নেতার ব্যক্তিগত কাজ হোক বা রাষ্ট্র ও সংগঠনের কাজ হোক, যে কোন কাজেরই হিসাব দলীয় কর্মী বা রাষ্ট্রের জনগণ চাইতে পারে। এমনকি দলীয় নেতৃবৃন্দ বা রাষ্ট্রের কর্নধাররা, তাদের স্ত্রীদের সাথে একান্তে কিরূপ ব্যবহার করেন, জনগণ তা-ও জানার অধিকার রাখে, এটাই হলো ইসলামে গণতন্ত্রের ধারণা, যা অতীতে খোলাফায়ে রাশেদীনদের শাসনামলে দেখা গিয়েছে এবং বর্তমানে নবী (দঃ) এর দেওয়া সংগঠন পদ্ধতিতে পরিচালিত ইসলামী সংগঠনে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যে দেশেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলন চলছে যে সমস্ত সংগঠনের মাধ্যমে, সে সব সংগঠনে ইসলামের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু আছে বলেই ঐ সমস্ত সংগঠন বা দলে উপদলীয় কোন্দল নেই, নেতা হবার খায়েশ নেই এবং দলে ইনশাল্লাহ কোন ভাংগন নেই।

আর ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র উচ্চাভিলাসী মনোবৃত্তির জন্ম দেয়। ফলে রাষ্ট্রে বা সংগঠনে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সৃষ্টি করে রাষ্ট্র বা সংগঠনকে নিঃশেষে বিলীন করে দেয়, যা জনগণের চরম অকল্যাণই বয়ে নিয়ে আসে।

পৃথিবীতে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের নীতিমালার কারণে মানবতার চরম অকল্যাণ ডেকে এনেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্মভীরু মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে, এরা ধর্ম কর্ম সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের লেবাছে ধর্মহীনতাকে আড়াল করার চোরাপথ অবলম্বন করে। এরা গণতন্ত্রের নামে মানুষকে মানুষের আইনদাতা বিধানদাতা প্রভু তথা খোদা বানিয়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মানুষ যদি মানুষের প্রভু হয়ে যায়, তাহলে মানুষের উপর থেকে মানুষের চরম স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটবে কিভাবে? গণতন্ত্রের নাম ভাঙ্গিয়ে প্রভাবশালী সুবিধাবাদী কিছু ব্যক্তি, সংসদে নির্বাচিত হয়ে জনগণের প্রতিনিধি সেজে জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করলে ও তাদেরই নির্বাচক মন্ডলীর উপর জুলুম করলে, এই জুলুমের প্রতিরোধ করা কিভাবে সম্ভব? জনগণের স্বাধীন মতামত জানার বাস্তব পন্থা কি হতে পারে? বিশেষতঃ সর্বসাধারণের মত (উইল অফ দি অল) থেকে (জেনারেল উইল) সাধারণ মত পর্যন্ত পৌছার যতগুলি পন্থা আছে, তা সবই যখন স্বার্থপর ও ক্ষমতা লোভী লোকদের দ্বারা কলুষিত হওয়ার পূর্ণ আশংকা রয়েছে, তখন

www.pathagar.com

জনমত কোন সময়ই কি স্বাধীন মত (ফ্রি উইল) লাভ করার মর্যদা লাভ করতে পারে? পক্ষান্তরে জনমতের পশ্চাতে ঐক্য ও স্থায়ীত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক এবং তাই হয়ে থাকে নির্ভুল মত (রাইট উইল)। কিন্তু জনমতের সব কার্যকারণই যে, নির্ভুল ও সত্য হয় এবং তা সর্ববস্থায়ই যে, সত্যিকার কল্যাণের দিকে পরিচালিত হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? কেননা রায় দেওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ং রায় দাতারই অজ্ঞাত থেকে যায় যে, তার প্রকৃত মত কি এবং তার কারণই বা কি? ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার বিভিন্ন ধর্ম, সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তার অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করবে না বলে ঘোষণা দিলেও, এ ধরনের সরকার ব্যবস্থার অধীনে কোন একটি দিকও ধর্মহীনতার বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের স্বকীয়তা সেখানে চূর্নবিচূর্ন হয়ে যায়।

আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও ভারতে এর সর্বব্যাপি বিষক্রিয়া বিভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতি ও জাতীয়তাকে জর্জরিত ও চূর্ন বিচূর্ণ করে দিয়েছে। প্রতিবেশী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত এর উজ্জল প্রমাণ। মানুষের মৌলিক অধিকারের (ফান্ডা মেন্টাল রাইট) দীর্ঘ তালিকা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু কোথাও তা কার্যকর হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কারণেই ফিলিস্তিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতের পাঞ্জাব, আসাম কাশ্মীর জীবন্ত আগ্নেয়গীরির রূপ ধারণ করেছে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহ মানবতাবাদের শ্লোগান অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে দিয়ে থাকলেও কালো চামড়ার মানুষগুলিকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে। মানবাধিকার প্রতি পদে পদে তারা লংঘন করে, নিজেরাই আবার নির্লজ্জের মত বিশ্বব্যাপি প্রচার মাধ্যমে মানব অধিকারের জিগির তোলে। মানুষের মৌলিক অধিকার এর ভিত্তি কি হবে– ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত মতৈক্যের সৃষ্টি হয়নি।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের প্রভাবে নৈতিক জীবন থেকে ধীরস্থির স্বভাব ও সৎ প্রবণতা, দৃঢ়তা সৎ সাহস এবং ভালমন্দের পার্থক্যবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুবিধাবাদী মনোভাব, স্বার্থপরতা ও সুযোগ সন্ধানী চরিত্র মানুষের মধ্যে উৎকট রূপ পরিগ্রহ করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন, মনের সন্তুষ্টি ও আত্মার পরিতৃপ্তিই নৈতিকতার মাপকাঠি। কারো মতে শুধু কর্তব্য পালন বা কর্তব্যই এই নীতিই হচ্ছে নৈতিকতার মানদন্ড। আবার কেউ পার্টিরও

www.pathagar.com

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকেই প্রকৃত নৈতিকতা বলে অভিহিত করেন এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ এর সন্তোষ বিধান করাকেই চরিত্রবান লোকের কর্তব্য বলে রায় দেন।

এইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বিভিন্ন পথ ও মতের সৃষ্টি করে দিয়ে নৈতিকতার ভিত্তি একেবারে ধ্বংস করে দেয়। আর সত্য কথা এই যে, ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে নৈতিক চরিত্রের ন্যায়, আর কোন কিছুই এত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কেন না ধর্মহীনতার ফলে জনগণ ব্যাপকভাবে নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পরিচিত ভাল কাজ সমূহ লোপ পায়। আর পরিচিত অপরিচিত খারাপ কাজসমূহ ব্যাপকভাবে সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বিভিন্ন দল, জাতি ও দেশের বুকে বড় বড় গাদ্দার সৃষ্টি হয়। ধমনিরপেক্ষতার প্রভাবে দলীয় জাতীয় ও দেশীয় স্বার্থের বিপরীত কাজ করার প্রবণতা জন্মলাভ করে মানুষের মনে। এই মতবাদের প্রভাবাধীন ব্যক্তি– কেন্দ্রিক দল গঠন করে, স্বৈরতন্ত্র ভিত্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে জুলুম নিস্পেষণ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কারণে, মানুষে মানুষে জাতীয় ও রাষ্ট্রে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রেরণা জোগায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। বর্তমান সমগ্র পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশ এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আলোচিত অশান্তির সম্মুখীন। যারা এই ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছে তারা এর প্রতিবিধানের কোন পথ খুজে পাচ্ছে না। ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে মানুষ পশুত্বকেও হার মানাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব সুদুর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সর্বত্র অর্থনৈতিক লুটতরাজ ও শোষণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ উৎপাদন, ব্যয় ও বন্টনের উপর কোন আইন ও শাসনের প্রতিবন্ধকতা থাকে না। সুদখোরী, ফটকাবাজারী ও জুয়া জুলুমমূলক লেনদেনের প্রচলন হয়। ধনী ও সচ্ছল লোকেরা দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের উপর অবাধ জুলুম ও শোষণের ষ্টীম রোলার চালায়। সমাজও দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগে থাকে জালেম ও শোষক নির্যাতকরা, অপর ভাগে থাকে মজলুম নির্যাতিত লোকেরা। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন বর্গীতন্ত্র প্রকট হয়ে উঠে, অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে। ধর্মঘট, ডেডলক, লক আউট ঘোষণা, কাজ না করা ও ধীর গতিতে (স্লোডাউন) কাজ করার প্রবৃত্তি সহ নিত্য নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। এর ফলে ব্যাপক আকারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ধন বন্টনের ক্ষেত্রে গগনচুম্বি অসাম্যের কারণে কখনো মুদ্রা স্ফীতি দেখা দেয়। আবার কখনও মুদ্রার পরিমাণ একেবারে হ্রাস পায়। ফলে বৈদেশিক ঋণ (লোন)

www.pathagar.com

গ্রহণ অথবা নিজেদের মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ অধিকাংশ দেশসমূহ এরই বাস্তব নিদর্শন।

ধর্ম নিরপেক্ষতা বর্তমানে, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশগুলির সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সমাজে যখন ব্যাপকভাবে মানসিক অশান্তির অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন গোটা সমাজ এর তীব্র আঘাত থেকে কিছুতেই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশসমূহে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত সতীত্ব ও পবিত্রতার ধারণা ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজে একেবারেই নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বার উন্মোচন করার কারণে, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে অবৈধ সন্তানের জন্মহার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলিকে রোধ করার জন্য বস্তুবাদী ম্যালথাসের মতবাদ "জন্ম নিয়ন্ত্রণের" (বার্থ কন্ট্রোল সিসটেম) উপায় উপকরণের উৎপাদন করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। বিবাহশাদির প্রয়োজনীয়তাবোধ লোপ পেয়েছে। স্বাধীন মেলামেশার সুযোগে সৌখিন ব্যাভিচার ব্যাপকরূপ লাভ করেছে। ফলে ভদ্রবেশী মানুষদের সাথে যৌনব্যাধি ভূত-প্রেতের মত লেগে আছে। এইডস নামক কালব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে। কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীরা পর্যন্ত, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হাইজ্যাক, ধোকাবাজী, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি নৈতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ আমেরিকার জনৈক বিচারপতি ক্ষোভের সাথে একবার বলেছিলেন "এই দেশের শতকার ৯৯% অবিবাহিত মেয়েরা সতীত্ব হারা, হয়ত একজনকে সতী বলতে পারি যে, তার সম্পর্কে পুরোপুরি তথ্য সংগ্রহ সম্ভবপর হয় নি"। বস্তুতঃ সমাজ জীবনে সতীত্ব ও পবিত্রতা, এই মহা মূল্যবান দুইটি জিনিষ সমাজ শৃংখলার প্রধানতম ভিত্তি। নারী ভ্রষ্টা হলে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়, আর পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হলে সমাজ জীবনের ভিত্তি ধসে যেতে বাধ্য। সুষ্ঠ পরিবারই হলো সুন্দর সমাজের অবকাঠামো। এজন্য নেপোলীয়ন বোনাপার্টি বলেছিলেন "আমাকে একটি সুন্দর মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি সুন্দর জাতি উপহার দিব"। সমাজ জীবন দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত হলে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। রক্তের সম্পর্কও ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। অসংখ্য বন্ধুতঃ শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। নরহত্যা, আত্মহত্যা ও ভ্রূণ হত্যার এক প্রলয়ংকরী বিভীষিকা গোটা সমাজকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্ম বিশ্বাসকে নির্মূল

www.pathagar.com

করার পরে মনের শূন্যতা পূরণের জন্য সাধারণভাবে মানুষেরা কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়াই জড়বাদ ও বস্তুবাদের উপর বিশ্বাস এনে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক চিন্তাশীল দার্শনিকরা এ পর্যন্ত যত ডিগবাজী দিয়েছেন তা পর্যালোচনা করলে উল্লেখিত কথার সত্য মিথ্যা উপলব্ধি করা যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ধর্মনিরপেক্ষবাদের ভাষায় যাকে বলে, ব্যক্তি স্বাধীনতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়, তখন এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ "সমুহবাদ" মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তখন সমষ্টির উপর ব্যক্তির জুলুম হওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তির উপর সমষ্টির জুলুম অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ ও সমূহবাদের মধ্যে বিরাট ও ব্যাপকভাবে স্থায়ী দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সূচনা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিকে মানুষ ও মানব সমাজের জন্য এক মর্মান্তিক আযাব ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? বর্তমানে পাশ্চাত্য জগৎ ও প্রাচ্যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে পারস্পারিক তীব্র দ্বন্দ্ব ও স্নায়ূ যুদ্ধই এর অকাট্য প্রমাণ। অবশ্য বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে অধগতি আরম্ভ হয়েছে, তাতে করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলি পাশ্চাত্যের দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হবে বলে মনে হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রাজনৈতিক মূল্যমান উত্তরকালে জনগণের স্বাধীন মত ও গণপ্রতিনিধিত্বের স্তর অতিক্রম করে এবং প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণী ও পরে অন্য একটি শ্রেণীর রায় মেনে নিতে রাষ্ট্র সরকারকে বাধ্য করে। তখন খোদায়ী সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্বের উপরে ভিত্তি করে যে গণতন্ত্র রচিত হয়, সে গণতন্ত্রও শুধু একটি মৌখিক শ্লোগানে পরিণত হয় এবং গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে বিশ্ববাসীকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা চলে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ব্যক্তি–চরিত্রকে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করে দেয়, ফলে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায় এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা প্রভু হয়ে জনসাধারণের খোদা বনে যায়। এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জুলুমমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। পরবর্তী সময়ে তা ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তথা সমাজতন্ত্র নামক এক অত্যাচারী ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। তাই বিদগ্ধ সুধী সমাজ বলে থাকেন "সামন্তবাদের বীষসন্তান পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদের অবৈধ সন্তান সমাজবাদ তথা সমাজতন্ত্র"। এই সমাজতন্ত্র যখন মানবীয় যোগ্যতা কর্মক্ষমতাকে নিছক উৎপাদনী শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে, সর্বত্র বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথার প্রচলন করে। ফলে মজুর শ্রমিকগণ কর্মকর্তাদের নিকট থেকে জন্তু

www.pathagar.com

জানোয়ারের অপেক্ষা উন্নত বা ভিন্ন কোন ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে না। আর এটাই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীন মানবজীবনের বাস্তব চিত্র।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ খোদা সম্পর্কে মানুষকে যে ধারণা দেয়, ঐ ধারণানুযায়ী খোদা হলো এক স্বার্থপর অবিবেচক লোভী দুর্বল সত্তা। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে যে ধারণা দেয়, সে ধারণা কোন মানুষের মনগড়া নয়। ইসলামের আল্লাহ শুধু মসজিদের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনা। শুধু মাত্র মসজিদের মধ্যে তিনি তার আইন প্রয়োগ করে ক্ষান্ত থাকেন না। ইসলামের আল্লাহর দেওয়া আইন মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন, রাষ্ট্রজীবন, আন্তর্জাতিক জীবন তথা মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। ইসলামের আল্লাহ এমন কোন দুর্বল সত্তা নন যে, তিনি কোন শক্তির সাথে আপোষ করে নিজের অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখবেন, বরং সৃষ্টি জগতের যাবতীয় সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার আইন মেনে চলবে। ইসলাম যে আল্লাহর ধারণা দেয়, সে আল্লাহ সব ধরনের লাভ-ক্ষতির অনেক উর্ধ্বে। সমস্ত মানুষ তার দাসত্ব করলে যেমন তার কোন লাভ হয় না, তেমনই তার দাসত্ব না করলে ও তার কোন ক্ষতি হয় না। তিনি মানুষের পূজা পাবার জন্য কাংগাল হয়ে যান না। তিনি মানুষ সৃষ্টি করে মানুষের জীবন চলার বিধান না দিয়ে মানুষকে পৃথিবীর মধ্যে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। ইসলামের আল্লাহ মানুষের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সমস্যা সম্পর্কেও উদাসিন নন। তিনি পৃথিবীর জটিল সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য মানুষকে নিরুৎসাহিতও করেননি। পৃথিবীর খনিজ সম্পদসহ যাবতীয় বস্তু ব্যবহার করে উন্নত সভ্যতা সৃষ্টির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তো দুরে থাক, বরং মানুষকে সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী সভ্যতা গড়ার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন আল কোরানে। তার সৃষ্টিসমূহ গবেষণা করে মানব জাতির কল্যাণের পথে ব্যবহার করার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে সুন্দর শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্য একটি ভারসাম্যমূলক বিধানও তিনি দিয়েছেন। মানুষের জীবনে পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত যত নিত্য নতুন সমস্যার উদভব ঘটবে, তার আগাম সমাধানও তিনি দিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের আল্লাহ এমন কোন দুর্বল সত্তা নন

www.pathagar.com

যে, তিনি ধর্মরিপেক্ষদের দাবির মুখে নিজের ক্ষমতার পরিধিকে সংকুচিত করে মসজিদের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করবেন। তিনি এমন অসহায়ও নন যে, ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিকদের করুণার পাত্র হয়ে তাদের দেওয়া স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। আল্লাহ এমন অবৈজ্ঞানিক নন যে, আইন বিধান রচনায় কোন অপূর্ণতা থাকবে আর ঐ অপূর্ণতা পূরণ করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুসারী ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঘৃণ্য তল্পী বাহকদের কাছে থেকে। ইসলামের আল্লাহ, সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব, আন্তর্জাতিক সাম্যমৈত্রীর বাণী বাহক, বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের সন্ধান দানকারী, শোষিত নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত জনতার মুক্তির দিশারী, নবীকুল শিরমনি, আখেরী জামানার পয়গম্বর নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর মানব জাতির জন্য এমন এক পূর্ণাংগ ও ত্রুটিহীন ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন, যার ঐতিহাসিক সত্যতা কেয়ামত পর্যন্ত অস্বীকার করার কোন পথ অবশিষ্ট নেই। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দান করেছে তা কোরান ও সুন্নাহর মধ্যে আজও অবিকৃত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃতই থাকবে। কোরানকে অবিকৃত রাখার দায়িত্বও স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন বলে আল কোরানে তিনি ঘোষণাও দিয়েছেন। বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে কোরানের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা প্রবেশ করতে পারেনি এবং করতে পারবেও না। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক পরীক্ষা যন্ত্র কম্পিউটারের সাহায্যে নিয়েও কোরানের ব্যর্থতা প্রমাণ করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, কম্পিউটার পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছে এটা ঐ মহান আরশের মালিক পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহরই বিশুদ্ধবাণী। ফলে বিংশ শতাব্দীর অমুসলিম চিন্তা নায়করা, যাদের পরিচিতি বিশ্বব্যাপী যথা, নীলআর্মষ্ট্রং, ডক্টর মরিস বুখাইলী, ডক্টর শিব শক্তি উদাসেনসহ অনেকেই কোরানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।

অতীতেও কোরান মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশে সমর্থ ছিল, বর্তমানেও সক্ষম এবং অনাগত ভবিষ্যতে ও কেয়ামত পর্যন্ত সক্ষম থাকবে। সর্বকালে সর্বদেশেই এই কোরান মানুষকে সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম বলে ঘোষণা করে প্রমাণিতও করেছে। আল্লাহর দেওয়া বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জীবন বিধান রচনা করা কোন সময়ই সম্ভবপর নয় বলে কোরান বার বার

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। যদি আরবী ভাষায় প্রেরিত কোরান বিকৃত করা সম্ভব হতো, তাহলে হয়তঃ ইসলামকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে রূপান্তরিত করা যেত। অন্য ভাষায় কোরানের অনুবাদ করে মূল কোরানের সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব হলে, হয়তঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম হতো। কিন্তু কোন সফল অনুবাদকেই কোরানের স্থলাভিষিক্ত করা অসম্ভব। একমাত্র আরবী ভাষায় প্রেরিত কোরানকেই মুসলমানরা কোরান বলে বিশ্বাস করে। মুসলমানদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা কোথাও সফলতা অর্জন করেনি। ধর্মের আলখেল্লা পরিহিত ইসলামের দুশমনদের দ্বারা কোরানের ভ্রান্ত অনুবাদ করে যতই মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করা হোক না কেন, মূল কোরান অক্ষত থাকার ফলে কোরানের সঠিক অনুবাদও হতে থাকবে এবং সেই ভ্রান্তি প্রতিরোধও চলতে থাকবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যতই ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করবে কোরান ততই দৃঢ়তার সাথে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধানের দাওয়াত দিতে থাকবে। সুতরাং ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংগ্রাম করার কোন সামান্যতম যোগ্যতাও নেই।

ইসলামকে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করে মানুষের সমাজ জীবনকে কোরানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার যে প্রচেষ্টা তুরস্কের নাস্তিক শাসক কামাল পাশা করে ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে আজ ডক্টর নাজিমউদ্দিন আরাবাকানের নেতৃত্বে ইসলামিক ন্যাশনাল স্যালভেশন পার্টি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আলজেরিয়া, পাকিস্তান, সুদান, মিশরসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে নরশার্দুল মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কোন প্রকার জেল জুলুম নির্যাতন এদের বেগবান বন্যার ন্যায় অপ্রতিরোদ্ধ গতি স্তব্ধ করতে পারছে না।

১৯৭১ সনের পরে বাংলাদেশের বুকেও ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রুশ ভারতের পদলেহী শাসকবৃন্দ ইসলামী নেতৃবৃন্দের নাগরিকত্ব বাতিলসহ জেল জুলুম হত্যা ও অমানুষিক নির্যাতন করেও শতশহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলার মাটিতে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র সফল করতে পারেনি। এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ভুলে গিয়েছিল যে, বাংলার মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি নয়, বাংলার মাটি ডাকাত সূর্যসেনের মাটি নয়, বাংলাদের মাটি সাম্প্রদায়িক বংকিম অথবা ঠেক চাঁদ ঠাকুরের মাটি নয়।

www.pathagar.com

বাংলার মাটি শহীদ তীতুমীরের মাটি, বাংলার মাটি হাজি শরিয়তুল্লাহর মাটি, বাংলার মাটি মুন্সি মেহেরুল্লাহর মাটি, বাংলার মাটি রসূলে আওলাদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানির রক্ত বিধৌত বাংলার জমিন। ১৯৭১ সন থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে এদেশের মুসলিমদের ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করানো যায়নি, তার বড় প্রমাণ, ঐ ধর্মদ্রোহী, ধর্মহীন শাসককে এদেশের নরশার্দুল মুসলিম সেনা অফিসার ও সাধারণ সৈনিকরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে যখন স্ববংশে উৎখাত করেছিল, তখন এদেশের ঈমানদার মুসলমানরা তথাকথিত হিন্দুয়ানী শ্লোগান "জয় বাংলা" ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে তাদের চির পরিচিত প্রাণের শ্লোগান "আল্লাহ আকবর", ধ্বনি দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শাসক উৎখাতকারী সৈন্যদের ট্র্যাংকের নলে ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

আজ আল্লাহর অসীম রহমতে এই বাংলার মাটিতে ইসলামী আন্দোলন এমন এক অপ্রতিরোদ্ধ গতিতে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে যে, এদেরকে প্রতিহত করতে মতের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নাস্তিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী দেয়। শুধু তাই নয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শক্তি নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তবুও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নাস্তিক শক্তি এতটুকুও দমাতে পারেনি, পারবেও না ইনশাল্লাহ।

ইসলামের সাথে যে অপকর্ম চলেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কের কামাল পাশা ধর্ম নিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন করেছিল। কিন্তু বিকৃত ইসলামের স্থানে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করে কামাল পাশা ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে আরবী ভাষা ও অক্ষরের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলো এবং ইসলামকে খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় বাস্তব জীবন থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু কামাল পাশার অবর্তমানে দীর্ঘদিন পর তুরস্কে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার যে নতুন ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তা কামাল পাশার ঘৃণ্য পরিকল্পনার ব্যর্থতাই ঘোষণা করছে। এজন্যই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের বিজয় পথে ইসলাম এক অপ্রতিরোদ্ধ ও অনতিক্রম্য বাধার বিন্ধাচলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোরআনকে বিনাশ করা সম্ভব নয় বলে, ইসলামকেও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদে পরিণত করা অসম্ভব। কোরআন মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে এত স্পষ্ট বিধান দিয়েছে যে, মূল

www.pathagar.com

কোরআন অবিকৃত থাকা অবস্থায় (থাকবে ইনশাল্লাহ) পেশি শক্তি প্রদর্শন করে সমাজ জীবন থেকে ইসলামকে উৎখাত করার সাধ্য কারো নেই।

ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলমান?

ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ সম্পর্কে বক্ষমান নিবন্ধে বিস্তারিত যে আলোচনা করা হলো, তা থেকে এটা পরিস্কার অনুধাবন করা যায় যে, ইসলামে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে না। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সহ পার্থিব জীবনের অন্য সকল বিভাগে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ মতাদর্শ অনুসরণের অবকাশ দেয়নি। ইসলামের অনুসারীরাই মুসলিম নামে অভিহিত। মুসলিম আরবী শব্দ। বাংলা অর্থ হলো "আত্মসমর্পণকারী"। মুসলমান দুই প্রকারের, এক প্রকার হচ্ছে, প্রকৃতিগত মুসলমান বা জন্মগত মুসলমান। দ্বিতীয় প্রকার মুসলমান হচ্ছে আদর্শগত মুসলমান।

ক) প্রকৃতিগত মুসলমানঃ- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসহ যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুই প্রকৃতিগত মুসলমান। অর্থাৎ সব কিছুই আল্লাহর আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সৃষ্টি কুলে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর আইন মেনে চলতে বাধ্য। বৃক্ষ তরুলতার উপরে আল্লাহর আদেশ হচ্ছে, স্বস্থানে অবস্থান করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করা ও পৃথিবীতে মানুষের ব্যবহারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা। গাছপালা তরুলতা তাই করছে অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মেনে প্রকৃতিগত মুসলমানের দায়িত্ব পালন করছে। পাথরকে যে ভাবে অবস্থান করতে বলা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, পাথর তাই করছে। এই সৌরমন্ডল এবং এর বাইরে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহর আইন মেনে চলছে। গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য ঐ দুর নীহারিকাকুঞ্জ বায়ু পানি অগ্নি বাকশক্তিহীন কীটপতংগ সহ যাবতীয় প্রাণী আল্লাহর আদেশ অনুসারেই চলছে। এরা সবাই মুসলমান, অর্থাৎ আল্লাহর আইনের কাছে আত্মসমর্পণকারী তথা প্রকৃতিগত মুসলমান। মানব দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ, শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহ সহ যে সমস্ত প্রকৃতিগত নিয়ম আল্লাহ মানব দেহে দিয়েছেন, মানব দেহ এ সব কিছু অনুসরণ করে চলছে। অভুক্ত অবস্থায় খাদ্য বিহীন স্টমাকে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সৃষ্টি হয়, এই এ্যাসিডের ধর্মই হলো কোন বস্তুকে গলিত অবস্থায় পরিণত করা। অথচ এই

www.pathagar.com

এ্যাসিড মানুষের পেটের মধ্যে নাড়ি ভুড়ি গলিয়ে দেয় না, শুধু মাত্র খাদ্য বস্তুগুলিকেই গলিত অবস্থায় পরিণত করে। অর্থাৎ এই এ্যাসিড ও আল্লাহর আইন মেনে চলে প্রকৃতিগত মুসলমানের পরিচয় দিচ্ছে। হাত চোখের কাজ করে না, কান পায়ের কাজ করে না, এদের স্রষ্টা এদেরকে যে কাজগুলি করতে বলেছেন, এরা সে কাজগুলিই করে যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এই দেহ পরিচালনা করার যে নিয়ম দিয়েছেন আল্লাহ, এই দেহ তা-ই অনুসরণ করে যাচ্ছে।

অর্থাৎ আল্লাহর নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীর যে কোন জাতির যে কোন লোকই প্রকৃতিগত মুসলমানের পরিচয় দিচ্ছে। আল্লাহ এই দেহকে নির্দেশ দান করেছেন, তোমার পরিচালক "আত্মা" তোমাকে যে ভাবে ব্যবহার করতে চায়, সেই ভাবেই তুমি ব্যবহারিত হতে থাকবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এই মানব দেহ তা-ই হচ্ছে। অর্থাৎ এই মানব দেহ মুসলমান বা আল্লাহর আইনের কাছে আত্মসমর্পণকারী।

খ) আদর্শগত মুসলমানঃ- পৃথিবীতে কোন প্রাণীর জন্য জীবন দর্শনের কোন প্রয়োজন হয় না মানুষ ব্যতিত। কেননা পৃথিবীর কোন প্রাণীরই মানুষের ন্যায় পরিবার সমাজ তথা রাষ্ট্র নেই। মানুষের জন্য এগুলির প্রয়োজন হয়। নভমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে তা সব কিছুই সৃজিত হয়েছে মানুষের খেদমতের জন্য। মানুষের সভ্যতাকে সুন্দর করার জন্য। মানুষ ব্যতিত পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকেই স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। পৃথিবীর মানুষ ব্যতিত সমস্ত সৃষ্টি কুলকেই নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শুধু মাত্র মানুষকেই স্বাধীন সত্তা হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ইত্যাদি দিয়ে মানুষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে এসে ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র গঠন করবে বলে মানুষের জন্য জীবন বিধান প্রয়োজন। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং তাদের জীবন পরিচালনার জন্য জীবন বিধান দেওয়ার দায়িত্বও আল্লাহর। তাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার নবীর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য যাবতীয় বিধিবিধান পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু মানুষকে গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেহেতু মানুষ আল্লাহর দেওয়া আদর্শ গ্রহণও করতে পারে আবার বর্জনও করতে পারে। যদি মানুষ আল্লাহর দেওয়া আদর্শানুযায়ী পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিচালনা করে,

www.pathagar.com

তাহলে দুনিয়াতেও শান্তি পাবে পরকালেও অনাবিল অফুরন্ত শান্তি পাবে। আর যদি মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া আদর্শানুযায়ী না চলে, নিজেদের খেয়াল খুশী মতো চলে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায়, তাহলে এ দুনিয়াতেও চরম অশান্তির মধ্যে পড়বে আর পরকালেও সীমাহীন কষ্টের সম্মুখীন হবে।

আর আল্লাহ তার নবীর মাধ্যমে যে আদর্শ দিয়ে দিয়েছেন, ঐ আদর্শ যারা মৌখিক ও আত্মিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের সকল বিভাগে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেছে, তারাই হলো আদর্শগত মুসলমান। আর এই দ্বিতীয় প্রকার মুসলমানদেরই কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ কর্মানুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার দান করবেন।

মুসলমান কোন দল , গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতির নাম নয়। মুসলমান কতকগুলি সমষ্টিগত গুণের নাম। কোন মানুষ যদি আল্লাহর দেওয়া আদর্শানুযায়ী পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করে অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া আদর্শ মেনে আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলী অর্জন করে তখন সে ব্যক্তি আল কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলমান বলে পরিচিতি লাভ করে। আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজ বা রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেই সমাজ বা রাষ্ট্রই হবে ইসলামী রাষ্ট্র। আল্লাহর দেওয়া আদর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুসলিম সমাজ।

মুসলিম মাতা–পিতার মাধ্যমে পৃথিবীতে আসলেই কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। ডাক্তারের ঘরে জন্ম নিলেই যেমন ডাক্তার হয় না, প্রকৌশলীর ঘরে জন্ম নিলেই যেমন প্রকৌশলী হওয়া যায় না তেমনি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই মুসলমান হওয়া যায় না। প্রকৌশলী বিদ্যা, ডাক্তারী বিদ্যা অর্জন করে যেমন ডাক্তার বা প্রকৌশলী হতে হয় তেমনি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই মুসলমানিত্ব অর্জন করে মুসলমান হতে হয়। চৌধুরীর ঘরে জন্ম নিয়ে যেমন চৌধুরী হওয়া যায়, খাঁনের ঘরে জন্ম নিয়ে যেমন খাঁন হওয়া যায়, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়ে যেমন ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তেমনই মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই মুসলমান হওয়া যায় না। হযরত নূহ (আঃ) নবী, কিন্তু তার নিজ ঔরশজাত সন্তান "কেনান" মুসলমানিত্ব অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে কাফের নামে পরিচিত লাভ করেছে। অতএব বোঝা গেল যে, মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলে মুসলমান হওয়া যায় না। ;ইতিহাসের আরেক অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন কাফেরের ঘরে। কাফেরের

www.pathagar.com

ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি হলেন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী। আল কোরআনে তাবে মুসলিম জাতির নাম দানকারী ও মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানিত্ব অর্জন করার জিনিষ, বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া কোন জিনিষ নয়। যারা আল্লাহর দেওয়া আদর্শ গ্রহণ করেছে কেবল মাত্র তারাই ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শগত মুসলমান।

কার্লমার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, আব্রাহাম লিংকন ও মাওসেতুং এর অনুসারী হয়ে বা তাদের চিন্তাধারা তথা আদর্শ গ্রহণ করে কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান দাবী করে, তাহলে সে দাবী কোরআনের কাছে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখিত হতে বাধ্য।

মুসলমানকে চিনবার মানদন্ড হলো কোরআন আর হাদিস। কোরআন হাদিসে মুসলমানের যে চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে, ঐ চরিত্র যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই মুসলমান। মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দেওয়ার পূর্বে কোরআন হাদিস থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে। আংশিকভাবে ইসলাম মেনে চলেও পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া যায় না। ইসলাম বলেছে, পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ করার ও মেনে চলার জন্য। কোরআনের কিছু অংশ নিজের সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ করা আর অপর অংশ বর্জন করার অধিকার ইসলাম দেয় না। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ করেছে তাদেরকে ইসলাম মুসলমান বলে স্বীকার করে কিনা, কোরআন হাদিসের কাছে থেকে ঐ তথাকথিত মুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের জানতে হবে। "মুসলমান নাস্তিক" কথাটা যেমন হাস্যকর তেমনই "ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলমান" কথাটাও কৌতুকপ্রদ। নিজেকে মুসলমান বলে সমাজে জাহির করবে, আবার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, পুঁজিবাদী আন্দোলন, ভোগবাদী খোদাহীন গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা মানুষের মনগড়া কোন আদর্শ নিয়ে আন্দোলন করবে, এ অধিকার ইসলাম দেয়নি। ইসলাম ঘোষণা করছে আল্লাহর দেওয়া আদর্শ ব্যতিত অন্য কোন আদর্শ, যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি মুসলমান নন। ইসলাম আল্লাহর দেওয়া আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ নিয়ে আন্দোলন করার অধিকার কোন ব্যক্তিকে দেয় না। যারা ইসলামী আন্দোলন ব্যতিত অন্য কোন আন্দোলন করে, ইসলাম তাদেরকে মুসলমান হিসাবে স্বীকার করে না। যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধীতা করছে, ইসলামপন্থীদের নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন ও হত্যা করছে, ইসলামী আন্দোলনের মিছিলে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, কোরআনের তাফসির মাহফিলের সাথে বিরোধীতা করে কোরআনের প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, তারা নিজেদেরকে যতই মুসলমান বলে দাবী করুক না কেন, ইসলাম এদেরকে

www.pathagar.com

মুসলমান বলে স্বীকৃতি দেয় না। মৃত্যুর পর ইসলামের রীতিনীতি অনুযায়ী দাফন কাফন জানাজা পাবার অধিকার এদের নেই। হয় পরিপূর্ণ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে হবে, নতুবা ইসলামের বিপরীত পথ অবলম্বন করতে হবে। মানুষের স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে, ইসলাম তাকে অনুসরণ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করে না। নিজেকে মুসলমান বা ইসলামের অনুসারী করার জন্য কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করে না। নিজেকে মুসলমান বা ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করে চলেছে এক শ্রেণীর মানুষ, আবার অপর দিকে বলছে, ইসলাম সেকেলে হয়ে গেছে (ব্যাকডেটেড)। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ইসলাম অচল। বিংশ শতাব্দীতে ইসলাম কোন অবদান রাখতে সক্ষম নয়, সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে মানুষের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্র, খোদাহীন ভোগবাদী গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ প্রয়োজন। এই সমস্ত কথাও বলবে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও করবে, খোদাহীন ভোগবাদী গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করবে, আবার নিজেকে মুসলমান বলেও দাবী করবে, এ দাবী তাদের মিথ্যা দাবী। ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা ইত্যাদি ভিত্তিহীন কথা বলবে, আবার মরার পরে এই নাস্তিকরা ইসলামী পদ্ধতিতে জানাজার জন্য দাবী করবে, আর মুসলমানরা তাদের হাস্যকর দাবী পূরণ করবে, এটা অসম্ভব। এরা আসলে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মুসলমানদেরকে প্রতারিত করতে চায়। নিজেদের ইসলাম বিরোধী মনোভাব আড়াল করার জন্যই নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম বানায়। এই ইসলামের দুশমনরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ ধর্মভীরু মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্যই মাঝে মধ্যে টুপি পাঞ্জাবী পরে ইসলাম দরদী বনে যায়। মসজিদে মসজিদে, ইসলামী মাহফিলে গিয়ে ইসলামের জন্য মায়া কান্না কাঁদে, ইসলামের জন্য কুমভীরাশ্রু বর্ষণ করে। ইসলামের চরম শত্রু এই মুনাফিকরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, মাওলানা নামধারী কিছু লোভী স্বার্থপর দরবারী আলেমদের ব্যবহার করে। যারা ইসলামের সাথে শুধু ধোকাবাজীই করে। এরা মুসলমানদের সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলে, ইসলামকে অনুসরণ না করলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। তারাই আবার ইসলাম বিরোধী যাবতীয় কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দেয়, এ ধরনের লোকগুলি কি কখনও চরিত্রবান হতে পারে? তাদেরকে ক্ষমতায় রেখে বা এ জাতীয় কোন দলকে দেশের বুকে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালাবার অধিকার দিয়ে দেশের কোন উন্নতি সম্ভব? সুতরাং কোন মুসলমানকে ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ার অধিকার ইসলাম যেমন দেয় না তেমনি ইসলামী আন্দোলন ব্যতিত অন্য কোন আন্দোলন করার সুযোগও ইসলাম দেয় না।

www.pathagar.com

ধর্ম নীরপেক্ষতাবাদীদের শ্রেণীভেদ

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা মৌলিকভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা অত্যন্ত ধূর্ত ও কৌশলী।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। প্রথম প্রকারের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করে। নিজেরা ধর্ম পালন করেও না, অপরকেও ধর্ম পালনে উৎসাহিত করে না। এরা সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে, এমন সব মতবাদ মতাদর্শ দেশের বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালায়, যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্ম এমনিতেই উৎখাত হয়ে যাবে। ধর্ম যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, মানুষ যাতে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার জন্য এই কৌশলী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা সব ধরনের চেষ্টা চালায়। মানুষের জীবনের সার্বিক বিধান যে ইসলাম, সে ইসলাম যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার অনুসারীদের মাধ্যমে চেষ্টা চালায়, তখন এই ধূর্ত ও কৌশলী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামের অনুসারীদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করে। পার্থিব প্রয়োজনে এরা ধর্মকে কাজে লাগায়। যেমন নির্বাচন এগিয়ে আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মভীরু জনগণের সমর্থন তথা ভোট লাভের উদ্দেশ্যেই এরা আল্লাহ ও রাসূলের নাম ব্যবহার করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা আংশিক ধর্ম পালন করেন। এরা নামাজ রোজা হজ্ব, যাকাত সবই আদায় করে। কিন্তু সমাজ নীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গন্ডি ছাড়া জীবনের অন্য সকল বিভাগে ইসলামী আদর্শ বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ভোগবাদী খোদাহীন গণতন্ত্র, নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ইত্যাদি মানুষের মনগড়া আদর্শের অনুসরণ করে। এরা মনে করে যে, ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ রোজা হজ্ব পালন করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। এরা কোরআন হাদিসকে শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পাঠ করে। আল্লাহর বিভিন্ন গুণবাচক নাম যত বেশী জপ করা যায়, আল্লাহর নৈকট্য ততই লাভ করা যায় বলে ধারণা পোষণ করে। ইসলামের সহজ বিধানগুলি অনুসরণ করে জান্নাত পাওয়ার সহজ পথ অবলম্বন করতে চায়। রছুল (সঃ) এর সহজ সুন্নতগুলি পালনে এরা খুবই তৎপর, কিন্তু আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য জানমাল কোরবান দিয়ে এরা এগিয়ে আসেনা।

www.pathagar.com

যারা ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলন করে, তাদেরকেও এরা সাহায্য সহযোগিতা করে না। নির্বাচন আসলে ইসলামী সংগঠন কর্তৃক নমিনেশন প্রাপ্ত প্রার্থীদের ভোট না দিয়ে, মানুষের তৈরী করা আদর্শ ভিত্তিক সংগঠন কর্তৃক নমিনেশন প্রাপ্ত প্রার্থীদের এরা ভোট দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই এরা দ্বিমুখী ভূমিকা গ্রহণ করে। কোরআনকে এরা ঝাঁড়ফুক ও তাবিজের কিতাব হিসাবে ব্যবহার করে। ইসলামকে উৎখাত করার জন্য ইসলামের চরম শত্রু এই কৌশলী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা যখন কোরআন তাফসির মাহফিল বন্ধ, ইসলামী শিক্ষাগারগুলি বন্ধ, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য কর্মসূচী গ্রহণ করে, তখন এই স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মের আলখেল্লা পরে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে ঐ ঘৃণিত কর্মসূচীর সমর্থনে জাতীয় পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দেয়। এরা ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে ধর্মকে উৎখাত করার কর্মসূচী সমর্থন করে। যদিও এরা সরাসরি ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলে না। আল্লাহর গজবের কথা এরা ভুলে যায়। আখেরাতের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির কথা ভুলে এরা মুসলমানদের মধ্যে ফতোওয়া বাজি করে দলাদলি সৃষ্টির ইন্ধন যোগায়। ইসলাম যাতে রাজনীতি, অর্থনীতি সহ রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য এরা ধর্মের বুলি মুখে আওড়িয়ে রাতারাতি পীর সেজে বসে সাধারণ মানুষের অর্থশোষণ করে। ফলে প্রকৃত হক্কানী পীর সাহেব কেবলা যারা ইসলামের জন্য জানমাল সবকিছু বিলায়ে দিতে সদা প্রস্তুত তারা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এতে একদিকে যেমন সমাজ ও রাষ্টজীবন থেকে ধর্মের মূলনীতি ও মূল্যবোধ উঠে গিয়ে ধর্মের নামে ধর্মহীনতা কায়েমের পথ সুগম হয়, তেমনই অপর দিকে যথার্থ পীর মাশায়েখদের আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কর্মসূচী ব্যাহত হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এই স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন এবং ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের খপ্পড় থেকে হেফাজত করে সঠিক ধর্ম পথের পথিকদের অনুসারী হওয়ার তৌফিক এনায়েত করুন।

আমিন,
ছুম্মা আমিন।

www.pathagar.com